তপোবন-এর শ্রীশ্রীঠাকুর-বিষয়ক গ্রন্থাবলী

ব্রজগোপাল দত্তরায় প্রণীত
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র (তিন খণ্ড)
পুরুষোত্তমজননী শ্রীশ্রীমনোমোহিনী

প্রফুল্লকুমার দাস প্রণীত
স্মৃতি-তীর্থে

দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত
ইষ্টভৃতি-মহাযজ্ঞ • নববেদায়ন • শিশুকথা
প্রিয়পরম • বিবাহ-পরিচয় • ধ্রুব-বিজ্ঞান
শ্রীশ্রীঠাকুরের দৃষ্টিতে দেব-দেবী • নববেদ বিধাতা

কুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত
মহামানবের সাগরতীরে (দুই খণ্ড) **• পরমপ্রেমময়**

পরেশ ভোরা প্রণীত
মহাজীবন (অখণ্ড সংস্করণ) **• ছোটদের শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র**
শ্রীশ্রীঠাকুর কথিত নিরামিষ রান্না

মণিলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত
স্মৃতির মালা • কত কথা মনে পড়ে • ঠাকুরবাড়ির আঙিনায়
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র ঃ কৃষ্টি, বিধান ও প্রশাসন

কিরণ মুখোপাধ্যায় সংকলিত
জীবন-বাদের অ আ ক খ

প্রিয়লতা দত্তরায় প্রণীত
তোমার আঙিনাতে

সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত
তত্ত্ব-কণা • তপঃপ্রকাশ

সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
কথায় ও ছবিতে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র
কথায় ও ছবিতে শ্রীশ্রীবড়মা
আলোকের এই ঝর্ণাধারায়

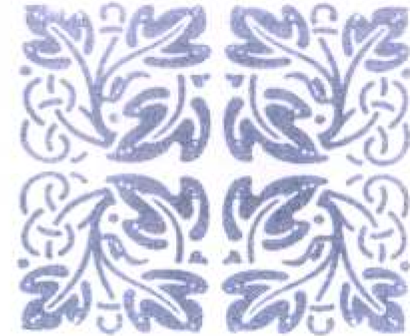
অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
প্রিয়পরমের আলোকে

বাসুদেব গোস্বামী প্রণীত
পুরুষোত্তম-লীলাপার্ষদ মহারাজ অনন্তনাথ ও ভক্তবীর কিশোরীমোহন

নিতাইচন্দ্র ভক্ত সংকলিত
শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কথিত ঃ পঞ্চনীতি

তপঃপ্রকাশ

সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়



তপোবন প্রকাশন

তপঃপ্রকাশ

তপোবন প্রকাশন
সাত্বত সাহিত্য প্রকাশনা



শ্রীশ্রীঠাকুর

"রা"

প্রত্যেক সৎসঙ্গীর অবশ্য পাঠ্য পুস্তক

তপঃপ্রকাশ

(কেবল সৎসঙ্গীদিগের জন্য)

সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়



তপোবন প্রকাশন

৩৩ কলেজ রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রকাশিকা
শ্রীমতী মায়া ভক্ত
৩৩ কলেজ রো
কলকাতা - ৭০০ ০০৯
দূরভাষ ঃ (০৩৩) ২২১৯ ৮৬১৫
ই-মেল tapoban_prakashan@yahoo.co.in

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ
প্রথম তপোবন সংস্করণ ঃ ভাদ্র, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
পুনর্মুদ্রণ ঃ বৈশাখ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ
পুনর্মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ

অক্ষর-বিন্যাশ
রীতা পাল
পশ্চিম শান্তিনগর, বেলুড়, হাওড়া

মুদ্রক
আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স
২৪৩/২সি, এ. পি. সি. রোড
কালকাতা - ৭০০ ০০৬

মূল্য ঃ ৩০.০০ টাকা মাত্র

"রা"

ভূমিকা

অধ্যাত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে সদ্‌গুরুর প্রতি একান্ত অনুরাগ থাকা চাই। অচ্যুত ইষ্ট-নিষ্ঠার ভিতর দিয়ে নাম বা শব্দ-যোগের সাধনা দ্বারা সাধক চরম বা পরম জ্ঞান লাভ করতে পারে। আর সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে আর কিছু জানার বাকী থাকে না, তাই শাস্ত্র বলেছেন ঃ—

"তস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বম্ জ্ঞাতম্ অস্তি"

তাঁকে জানলে সবই জানা হয়। আমাদের ভিতরে যা কিছু অপূর্ণতা আছে, অজানতা বা অজ্ঞানতাই তার হেতু। জ্ঞান-সূর্য্য উঠলে অজ্ঞান অন্ধকার দূরে পালায়, জীবনের সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্বের অবসান হয়, আর শান্তি আসে তখনই। মানুষ জীবনে শান্তি পেতে চায়। শান্তি পেতে হলে সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনা আবার সহজ, সরল ও সকলের সর্ব্বাবস্থায় অনুসরণযোগ্য হওয়া চাই। সে-দিক দিয়ে বিচার করলে নাম বা শব্দ-যোগের সাধনাই সর্ব্বরকমে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেশদা তাঁর এই পুস্তকে অতি সহজ ভাষায় শব্দ-যোগ সাধন পদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন। এই পুস্তকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে ঃ— (১) ইষ্টের প্রতি বৃত্তিভেদী টান। (২) পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদিগের সংক্ষিপ্ত

পরিচয়। (৩) ''রাধাস্বামী'' নামের অর্থ ও প্রচার। (৪) দীক্ষা ও আসন। (৫) নাম জপের, ধ্যানের ও ভজনের বিধি, বিঘ্ন ও প্রতিকার। (৬) সদ্‌গুরুর সহিত সৎসঙ্গীদিগের ব্যবহার। (৭) সৎসঙ্গী ও সর্ব্বসাধারণের সহিত সৎসঙ্গীদিগের ব্যবহার। (৮) সামাজিক ক্রিয়াকলাপ।

সৎসঙ্গী মাত্রেই শ্রদ্ধা সহকারে এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। এই পুস্তক প্রত্যেক সৎসঙ্গীরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।

বড়াল বাংলো, বৈদ্যনাথ, দেওঘর — **শ্রীসুশীলচন্দ্র বসু**, বি.এ.
১লা বৈশাখ, ১৩৫৬



৺সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (গ্রন্থকার)

বিষয় নিরূপণ

"রা"

লেখকের অপর তিন খানি বই

তত্ত্বকণা

(সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সৎনাম, সদ্গুরু, সৎসঙ্গ, কুলগুরু, মূর্ত্তিপূজা, পঞ্চমকার, গুর্ব্বন্তর-পরিগ্রহ, পুনর্জ্জন্ম, চৌরাশীলক্ষ-যোনির হিসাব প্রভৃতি বহু বিষয় সন্নিবেশিত।)

সোজা কথা (পদ্য)

(সদ্গুরুর লক্ষণ, আদর্শ, শিক্ষা, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, ভক্তি, প্রেম, বিশ্বাস, বিবাহ, সমাজ ও সেবা সম্বন্ধে নীতি।)

কৃষ্টি-প্রদীপ

(সংসারের অসারত্ব, সৃষ্টির রহস্য, পশু অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের সম্বন্ধ, মনের বন্ধন ও মুক্তি, গণ্ডিবদ্ধ আত্মা ও গণ্ডিমুক্ত আত্মা, আমিত্বের প্রসার, সুপথ ও কুপথ, আত্মজ্ঞানের ও ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা, সাকার ব্রহ্ম ও মানুষ ভগবান, তত্ত্বদ্রষ্টা, সদ্গুরু, সাধনার তুক এবং "কু"মনের ও "সু"মনের কার্য্যকলাপ প্রভৃতি।)

নিবেদন

অনেক দিন থেকে আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে সৎসঙ্গী দাদাদের ও মায়েদের অবগতির জন্য আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, রাধাস্বামী নাম, নাম জপ, ধ্যান ও ভজন সম্বন্ধে কিছু লিখি। কতকটা লিখেও ছিলাম কিন্তু তা অসম্পূর্ণভাবে এতদিন পড়েই ছিল। সম্প্রতি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ঋত্বিগাচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যদাদা আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করায় আমি পুস্তকখানির লেখা শেষ করে ও পরম দয়ালের অনুমোদন নিয়ে বইখানা ছাপালাম।

বইখানা পড়ে যদি কাহারও সামান্য একটু উপকার হয় তা হলেই আমি লেখার সার্থকতা বোধ করবো। শ্রীশ্রীঠাকুর পুস্তকের নাম দিয়েছেন "তপঃপ্রকাশ"। বয়স হয়েছে অনেক, ৮৬ পার হলো। লেখার ও ভাষার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাই সম্ভব, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ইতি

দীন সেবক

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বৈদ্যনাথ—দেওঘর

সন ১৩৫৬ সাল, আষাঢ়

তপঃপ্রকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইষ্টে বৃত্তিভেদী টান

সৎসঙ্গী দাদাদের ও মায়েদের মধ্যে প্রায় সকলেই জানেন বা শুনেও থাকবেন যে আমাদের পরমারাধ্য পরম প্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম জীবনে, পাঠ্যাবস্থার পর, যৌবনের প্রারম্ভে, ২৩/২৪ বৎসর বয়সের সময় সংকীর্ত্তনের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর মহাভাব-সমাধি হতো এবং সেই সমাধিস্থ অবস্থায় পরমার্থ সম্বন্ধে উচ্চতর তত্ত্বের বহু বাণী তাঁর মুখ হতে নির্গত হয়েছিল।

সেই বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি সুস্পষ্টভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন যে তিনি কে, এবং কি জন্যই বা দেহ ধারণ করে জগতে এসেছেন।

আবার ঐ বাণীর মধ্য দিয়েই শুদ্ধাত্মা থেকে মহাপাপাত্মা পর্য্যন্ত বিশ্ববাসী সকলকেই আহ্বান করেছেন—"কে কোথায় আছিস—শিখ, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, চণ্ডাল ছুটে আয়, আমায় বিশ্বাস কর, প্রাণ দিয়ে ভালবাস। তোদের জ্বালা যন্ত্রণা আমার হাত দিয়ে সব মুছে দেব। অন্তরে অন্তরে নাম কর, নামে ডুবে পড়। আমি আত্মা, আমি পরমাত্মা, আমি পরব্রহ্ম, আমি অনামী, তোদের অন্তরে অন্তরে জেগে উঠবো।" আবার বলেছেন রাধাস্বাম্যহং ইত্যাদি, ইত্যাদি, কত কিছু। কত অভয় ও আশ্বাস বাণী দিয়েছেন।

পরম দয়ালের এই ডাক যাঁদের কানে প্রবেশ করে হৃদয় স্পর্শ করেছে তাঁরা একে একে সকলেই শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ তলে এসেছেন ও আসছেন, নিজের নিজের জীবনের উৎকর্ষ বা সার্থকতা লাভের জন্য।

বর্ত্তমানে আমরা প্রায় চার লক্ষাধিক সৎসঙ্গী (বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী ও পুরুষ) হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে এসে সর্ব্বোচ্চ সত্যনামে দীক্ষিত হয়েছি।

বহু জন্মের সুকৃতি ও সৌভাগ্যের ফলে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। পেয়েছি বটে কিন্তু আমাদের সেই পাওয়াটা এখনও পূর্ণ হয়নি, অর্থাৎ তিনি যে মহান পুরুষ ইষ্টপ্রতীকে আবির্ভূত হয়েছেন, পুরুষোত্তম রূপে নরদেহে আবির্ভূত হয়েছেন, তা আমরা এখনও তত্ত্বতঃ উপলব্ধি করতে পারিনি। দ্বাপর যুগে অর্জ্জুন যেমন শ্রীকৃষ্ণের দেহের ভিতর দিয়ে তাঁকে "ভগবান" বোধ করেছিলেন আমাদিগকেও সেইরূপ শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহের ভিতর দিয়েই তাঁর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে। এবং আমরা তাই অনুভব করতে পারছি না বলে তিনি পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে জানাচ্ছেন যে কি করলে আমরা তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি, তাঁকে সেই পুরুষোত্তম বলে বোধ করতে পারি। এ সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে দুটি ছড়া দিয়েছেন, সেই ছড়া দুটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল ঃ

(১) "অসীম যখন সসীম হয়ে
সীমায় করে বাস।
সসীমতে দেখলে অসীম
তবেই কাটে ফাঁস।।"

(২) "অসীম যখন সহজ জ্ঞানে
সীমায় লয় স্থান।
বৃত্তিভেদী টান হলে তাঁয়
দেখবি ভগবান।।"

উপরোক্ত দুইটি ছড়া থেকে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি যে কি করলে আমাদের বন্ধন কাটে এবং কি করলে আমরা তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারি। তিনি বলেছেন যে তাঁর উপর বৃত্তিভেদী টান হলে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। এখন বৃত্তিভেদী টান কি করলে জন্মায় তারই উপায়-স্বরূপ তিনি আমাদিগকে কতকগুলি নিয়ম পালন ও অন্তর অভ্যাসের কাজ দিয়েছেন। ঐগুলি যথাযথভাবে পালন করতে পারলেই বৃত্তিভেদী টান গজাবে।

আমাদের মনটা পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বিষয়বস্তুর রস (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) আস্বাদন ক'রে আনন্দ পায়, কাজেই ঐ সব বিষয়বস্তুতে রস বা আনন্দ পাওয়া হেতু মনটা আটকে গিয়েছে, ঐ সব তাতেই মনের টান। পাঁচটা ইন্দ্রিয় মনটাকে পাঁচদিকে টানাটানি করছে, ইষ্টের দিকে যেতে দিচ্ছে না। এখন আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত নিয়মগুলি পালন ও অন্তর অভ্যাস দ্বারা আমাদের মনটাকে বিষয়বস্তু থেকে ফিরিয়ে এনে শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে যুক্ত করতে পারলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে। এবং আমরা তাই করবার জন্যই তো তাঁর শ্রীচরণতলে এসে জুটেছি।

আমাদিগের যা যা করণীয় তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি প্রধান ঃ

(১) নাম জপ, (২) ধ্যান, (৩) ভজন, এবং ইহাদিগের আনুষঙ্গিক যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী, সৎসঙ্গ ও সেবাদি।

উপরোক্ত কাজগুলি ও নিয়ম পালন সম্বন্ধে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ঋত্বিগাচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সৎসঙ্গীদিগের

সুবিধার্থে 'অনুসৃতি' পুস্তকে উপদেশ দিয়েছেন। এখন আমি নাম, ধ্যান ও ভজন সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে কিছু লিখতে সচেষ্ট হয়েছি। জানিনা আমি কতদূর কৃতকার্য্য হব, কারণ বিষয়টা সবখানি ভাষায় প্রকাশ করা আমার মত লোকের পক্ষে কঠিন। তবুও দয়ালের চরণ স্মরণ করে একবার চেষ্টা করে দেখি যদি এ সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোও সৎসঙ্গী দাদাদের ও মায়েদের মধ্যে দিতে পারি। ভরসা একমাত্র দয়ালের কৃপা ও প্রেরণা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদিগের পরিচয়

নাম, ধ্যান ও ভজন সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই সর্বাগ্রে দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সদ্গুরু, সৎনাম ও সৎসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমার লিখিত 'তত্ত্বকণা' পুস্তকে উপরোক্ত বিষয়গুলি তো আছেই, তা ছাড়া মূর্ত্তিপূজা, গুর্ব্বন্তর-পরিগ্রহ, কুলগুরু, পুনর্জন্ম ও কর্ম্মফল প্রভৃতি বহু বিষয়ের মীমাংসা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার এই পুস্তক পাঠ করার পূর্ব্বে 'তত্ত্বকণা' পুস্তকখানি প্রত্যেকেরই আদ্যোপান্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য, কারণ উক্ত পুস্তকে পরমার্থ লাভের উপায়-স্বরূপ প্রয়োজনীয় বহু বিষয়ের মীমাংসা করা হয়েছে। সুতরাং এখানে ঐগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রোয়জন, কারণ সৎসঙ্গী দাদাদের ও মায়েদের মধ্যে প্রায় সকলেই 'তত্ত্বকণা' পুস্তক পাঠ করেছেন। যাঁহারা ঐ পুস্তক পাঠ করেননি, তাঁহাদিগকে পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

আমরা সকলেই দীক্ষিত। দীক্ষা দেওয়ার সময় দীক্ষাদাতা, সৎগুরু, সৎনাম ও সৎসঙ্গ সম্বন্ধে দীক্ষা গ্রহণকারীকে বুঝিয়ে দেন। নাম জপের ও ধ্যানের প্রণালী বলে দেন। কিভাবে নাম ও ধ্যান করাটা সহজ ও ঠিক ভাবে করা যায় এই পুস্তকে সেই সম্বন্ধে কিছু লিখতে চেষ্টা করছি। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ দাদারা ও মায়েরা ভজনের

উপদেশ এখনও পান নাই, কাজেই ভজন সম্বন্ধে যতটুকু লেখা সম্ভব তাই লেখা হবে।

দীক্ষার সময় আমরা নাম পেয়েছি "রাধাস্বামী"। এই নাম উপদিষ্ট প্রণালীতে দেহের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থানে জপ করতে হয়। "রাধাস্বামী" নাম কিন্তু আমাদের কোন হিন্দুশাস্ত্রে নাই। বাঙ্গালা দেশে তো ছিলই না, শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে পশ্চিম প্রদেশে পাঞ্জাব, এলাহাবাদ, আগরা ও কাশী প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত ছিল ও আছে। কি প্রকারে ঐ সব অঞ্চলে এই নাম প্রচলিত হলো জানিবার একটা কৌতূহল সৎসঙ্গী মাত্রেরই হওয়া স্বাভাবিক, তাই আমি এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করছি।

প্রায় ৭/৮ শত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম প্রদেশে কবীর নামে এক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জাতিতে, কেহ বলেন মুসলমান ছিলেন; কেহ বলেন তিনি এক বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র, মুসলমানের (জোলার) ঘরে প্রতিপালিত হয়েছিলেন বলে তাঁকে সকলেই মুসলমান বলেই জানতো। তাঁর জন্ম সম্বন্ধে একটা ইতিহাস আছে, তা এখানে লিখতে গেলে এই পুস্তকের কলেবর বেড়ে যায়। তাঁকে পশ্চিম প্রদেশে পরম সন্ত বলেই জানে। তাঁর শিষ্যদিগকে কবীরপন্থী বলে বোধ করি একথা অনেকেই শুনে থাকবেন। কবীর সাহেবের বহু শিষ্য ছিল, হিন্দু ও মুসলমান। প্রবাদ আছে দেহান্তে শব নিয়ে উভয় দলে ঝগড়া হয়। মুসলমানরা কবর দিতে চায় আর হিন্দুরা সৎকার করতে চায়। তারপর শবঢাকা চাদরখানা উঠিয়ে দেখা যায় যে শব নাই, তার পরিবর্ত্তে এক রাশি সুগন্ধি ফুল রয়েছে। তখন ঐ ফুল দুই দলে ভাগ করে নিয়ে মুসলমানেরা কবর দেয় আর হিন্দুরা সৎকার করে। মহাত্মা কবীর তাঁর শিষ্যদিগকে সত্যনাম দিতেন। বহু

পুস্তক ও দোঁহা তিনি লিখে গিয়েছেন। দোঁহার মধ্যে এক স্থানে একটি দোঁহাতে ইসারায় "রাধাস্বামী" নামের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই দোঁহাটা এই ;—

"কবীর ধারা অগমকী সদ্‌গুরু দয়ী লখায়।
উলট তাহি সুমিরণ করো স্বামীসঙ্গ লাগায়।।"

অর্থাৎ সদগুরু অগমের ধারা দেখিয়েছেন, ধারা উল্‌টে নিয়ে স্বামী সঙ্গে যোগ করে জপ কর। ধারা উল্‌টালে রাধা হয়। এই "রাধা" কথাটাকে "স্বামী" কথাটার সঙ্গে যোগ করলে "রাধাস্বামী" হয়। কবীরের পর গুরু নানক সন্তরূপে জন্মেছিলেন। তিনি সত্যনামের উপাসনা করতেন এবং তাঁর শিষ্যদিগের মধ্যেও ঐ নাম প্রচলন করেছিলেন। তাঁর শিষ্যদিগকে নানকপন্থী বলে।

কবীরের জন্মের বহুকাল পরে প্রায় ৭ শত বৎসর পরে, আগরাতে শিবদয়াল সিং নামে এক মহাপুরুষ জন্মান। তিনিও তাঁর শিষ্যগণকে প্রাণায়ামের সহিত সত্যনামই দিতেন। আমাদের "রাধাস্বামী" মতের প্রথম গুরুই তিনি। তিনি আমাদের কাছে "স্বামীজী মহারাজ" নামে খ্যাত। স্বামীজী মহারাজের নাম যখন আগরা সহরে বিস্তার হয়ে পড়ে তখন রায় সালিগরাম রায় বাহাদুর নামে এক মহাপুরুষ স্বামীজী মহারাজের ওখানে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনিও সত্যনামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় মহাপুরুষ আমাদের মধ্যে "হুজুর মহারাজ" নামে খ্যাত। ইনি সত্যনাম অভ্যাসের দ্বারা পরম বা চরম পদের, "রাধাস্বামী" পদের সন্ধান পান এবং তাঁর গুরুর নিকট অর্থাৎ স্বামীজী মহারাজের চরণে প্রার্থনা করেন যে সত্যনামের উপরেও যখন "রাধাস্বামী" নাম রয়েছে তখন এই আদি নাম জগতের জীবকে দিয়ে তাদের পূর্ণ মুক্তির অধিকারী করুন। সেই

থেকে অর্থাৎ স্বামীজী মহারাজের সময় থেকে এই নাম প্রচলিত হয়েছে। প্রাণায়ামের ক্রিয়া বাদ দেওয়া হয়েছে।

হুজুর মহারাজের অন্তর্ধানের পর তাঁর প্রধান শিষ্য পণ্ডিত ব্রহ্ম শঙ্কর মিশ্র (মহারাজ সাহেব নাম খ্যাত) গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি আমাদের পূর্ব গুরুদিগের মধ্যে তৃতীয় গুরু। মহারাজ সাহেবের অন্তর্ধানের পর, কিছুকাল পরে পশ্চিম প্রদেশের ঐ সৎসঙ্গ দ্বিধাবিভক্ত হয়। প্রধান বিভাগ আদি সৎসঙ্গ স্বামীবাগ—আগরায়। দ্বিতীয় বিভাগ নূতন সৎসঙ্গ আরম্ভ হয় গাজীপুরে, পরে মুরারে। এই নূতন সৎসঙ্গের অধিষ্ঠাতা বাবু কামতা প্রসাদ (সরকার সাহেব নামে খ্যাত)। ইনি চতুর্থ গুরু।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে ৪ জন পূর্ব্বগুরুদিগকে পাওয়া গেল, যথা ঃ

(১) স্বামীজী মহারাজ—প্রথম গুরু
(২) হুজুর মহারাজ—দ্বিতীয় গুরু
(৩) মহারাজ সাহেব—তৃতীয় গুরু
(৪) সরকার সাহেব—চতুর্থ গুরু

ইহাদিগের মধ্যে কে কত দিন সৎসঙ্গ পরিচালনা করেছিলেন তা পরে দেখাচ্ছি।

স্বামীজী মহারাজ (শিবদয়াল সিং) সম্বৎ ১৮৭৫ সালে ভাদ্র মাসে, ইংরাজী ১৮১৮ সালে আগষ্ট মাসে আগরা সহরে পন্নীগলিতে কৃষ্ণাষ্টমীর দিন রাত সাড়ে বারটার সময় ক্ষত্রীয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৬/৭ বৎসর বয়স থেকেই ইনি সর্ব্বোচ্চ পরমার্থ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার কেহ গুরু ছিলেন না। যখন ইঁহার বয়স ১৫ বৎসর তখন তিনি ২/৩ দিন পর্য্যন্ত একাদিক্রমে

ঘরের মধ্যে নির্জ্জনে সাধনা করতেন। ঘরের বাহির হতেন না, এমনকি খাওয়া দাওয়া, বাহ্য প্রস্রাব পর্য্যন্ত করতেন না। ইংরাজী ১৮৬১ সালে জানুয়ারী মাসে বসন্ত পঞ্চমীর দিন সাধারণভাবে সৎসঙ্গ আরম্ভ করেন এবং ইংরাজী ১৮৭৮ সালে ১৫ই জুন শনিবার দেহত্যাগ করেন। ইঁহার সৎসঙ্গ-কেন্দ্র ছিল নিজবাটী, পরে স্বামীবাগ।

স্বামীজী মহারাজের পিতার নাম লালা দিলওয়ালী সিং। ইনি গুরু নানকের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন এবং তাঁর বাণী শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করতেন। ঐ সময়ে তুলসী সাহেব নামে একজন সন্ত সদ্‌গুরু (হাতরাসবাদী) মাঝে মাঝে আগরায় আসতেন এবং স্বামীজীর পিতার সহিত সাক্ষাৎ ও পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। উপরে লেখা হয়েছে যে স্বামীজী মহারাজ ৬/৭ বৎসর বয়স থেকে সর্বোচ্চ পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। সন্ত তুলসী সাহেব স্বামীজী মহারাজের উপরোক্ত ভাব দেখে তাঁর মাকে বলেছিলেন যে তোমরা এই বালককে পুত্র ভাবে দেখো না। ইনি পরম সন্ত সদ্‌গুরুরূপে তোমার এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই থেকে বাড়ীর সকলেই তাঁকে গুরুভাবে দেখতেন।

স্বামীজী মহারাজের দেহত্যাগের পরে হুজুর মহারাজ গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি ইংরাজী ১৮২৮ সালে ১৪ই মার্চ শুক্রবার ফাল্গুন মাসের অষ্টমী তিথিতে কায়স্থ বংশে আগরা সহরে পিপলমণ্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন ও ইংরাজী ১৮৫৮ সালে নভেম্বর মাসে স্বামীজী মহারাজের কাছে দীক্ষিত হন এবং ১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সৎসঙ্গ পরিচালনা করিয়া ঐ ডিসেম্বর মাসেই দেহত্যাগ করেন। ইঁহার সৎসঙ্গ-কেন্দ্র আগরায় নিজবাটী ও স্বামীবাগ। আমাদিগের স্বর্গীয়া পরমারাধ্যা জননী মনোমোহিনী দেবী

এই দ্বিতীয় গুরু হুজুর মহারাজের নিকট দীক্ষিতা হয়েছিলেন, তাঁর বিবাহের পূর্ব্বেই, অষ্টম বর্ষ বয়সে। "রাধাস্বামী" নাম জননী দেবী দীক্ষার পূর্ব্বেই পেয়েছিলেন, তাঁর বিস্তৃত বিবরণ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী পুস্তকে তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। হুজুর মহারাজ যুক্ত প্রদেশে ডাক বিভাগে কেরাণীর পদে নিযুক্ত হয়ে পোষ্টমাষ্টার জেনারল পর্য্যন্ত হয়েছিলেন। বর্ত্তমানে আমরা যে পোষ্টকার্ড ব্যবহার করি তা ইঁহারই প্রবর্ত্তিত। সরকার থেকে ইনি রায় সাহেব উপাধি পেয়েছিলেন।

হুজুর মহারাজের দেহত্যাগের পর তাঁর প্রিয় শিষ্য পণ্ডিত ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র (মহারাজ সাহেব) কিছুদিন প্রধান শিষ্য রূপে সৎসঙ্গ পরিচালনা ক'রে পরে গুরু পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ইংরাজী ১৮৬১ সালে মার্চ মাসে কাশীধামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজী ১৮৮৫ সালে নভেম্বর মাসে হুজুর মহারাজের কাছে দীক্ষিত হন এবং ইংরাজী ১৯০৭ সালে ১২ই অক্টোবরে দেহত্যাগ করেন। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ., এলাহাবাদে একাউন্টান্ট জেনারল আফিসে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাজ করতেন। সেইখানেই ইঁহার সৎসঙ্গ-কেন্দ্র ছিল, পরে ৺কাশীধামে নিজবাটীতে। ইঁহারই এক পুত্রের সঙ্গে কলকাতা নিবাসী এক সৎসঙ্গী নির্ম্মল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রীর বিবাহ হয়েছিল। বিবাহের কিছুদিন পরে কন্যাটি জলে ডুবে মারা যায়। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাঙ্গালীর বৈবাহিক সম্বন্ধ এই প্রথম।

এ দীন-সেবক এই তৃতীয় গুরু মহারাজ সাহেবের নিকট ইংরাজী ১৯০৬ সালে ১৯শে আগষ্ট (৩রা ভাদ্র) দীক্ষিত হয়।

মহারাজ সাহেব তাঁর দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্ব্বে একটা কাউন্সিল (council) গঠন করেছিলেন। ঐ কাউন্সিলে কয়েকজন সদস্য

ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কামতা প্রসাদ বাবু (পরে সরকার সাহেব নামে পরিচিত) পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য হওয়ায় গাজিপুরে সৎসঙ্গ স্থাপন করেন, পরে মুরারে। তিনি বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। ১৯১৩ সালে ডিসেম্বর মাসে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর বাবু আনন্দ স্বরূপ (সাহেবজী নামে খ্যাত)—সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং আগরায় দয়ালবাগ নামে সৎসঙ্গ-কেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনিও দেহত্যাগ করেছেন। দয়ালবাগে বর্ত্তমানে কাহার দ্বারা সৎসঙ্গ পরিচালিত হচ্ছে আমার জানা নাই। আদি সৎসঙ্গ আগরায় স্বামীবাগে বাবু মাধো প্রসাদ গুরুপদে অধিষ্ঠিত হয়ে পরিচালনা করছেন। আদি সৎসঙ্গে কোন কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান নাই, কেবল পরমার্থ সম্বন্ধে আলোচনা, সৎসঙ্গ ও উপাসনাদি হয়। দয়ালবাগে বহু কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান (activities) আছে। স্বামীবাগ ও দয়ালবাগ কাছে কাছেই, একটা বড় রাস্তা মাঝখানে ব্যবধান। উভয় কেন্দ্রের মধ্যে কোন সংস্রব নাই। প্রত্যেকেই স্বাধীন। এ সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

হিন্দী পুস্তকগুলি পড়ে দেখা যায় যে পূর্ব্ব গুরুদিগের দরবারে একজন করে গুরু-মুখ থাকতেন। গুরুর দেহরক্ষার পর তাঁরাই গুরু পদে অধিষ্ঠিত হতেন। যেমন কবীরের গুরু-মুখ ছিলেন ধর্ম্মদাস। স্বামীজী মহারাজের গুরু-মুখ ছিলেন হুজুর মহারাজ। হুজুর মহারাজের গুরু-মুখ ছিলেন মহারাজ সাহেব। মহারাজ সাহেবের কোন গুরু-মুখ ছিল কিনা জানা নাই, তবে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ভাববাণীতে বলেছেন "সরকার সাহেব সন্ত"। সরকার সাহেব তো মহারাজ সাহেবের দরবারেই ছিলেন, মনে হয় তিনিই মহারাজ সাহেবের গুরু-মুখ ছিলেন। তাঁর পৃথকভাবে সৎসঙ্গ জারি করার কারণ পূর্ব্বেই বলেছি।

গুরু-মুখেরা গুরু পদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে নিজ নিজ গুরুদিগের নিকট অভ্যস্ত ভাবধারা ও কার্য্যকলাপ অনুসরণ করে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেছেন ও করছেন। সুতরাং তথাকার উপদিষ্ট সৎসঙ্গীরাও ঐভাবে অভ্যস্ত ও ভাবিত হয়ে থাকেন।

আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর গুরু-মুখভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কোন গুরুর নিকট যান নাই বা উপদিষ্ট হন নাই। তিনি স্বয়ং গুরু রূপে, পুরুষোত্তম রূপে দেহ ধারণ করে জীবের উদ্ধারের জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। কি ভাবে কি করলে জীবের মঙ্গল হয় তা তিনিই জানেন, তাঁর কার্য্যকলাপও সেইভাবে পরিচালিত হয়। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে ভাবধারার ও কার্য্যকলাপের পার্থক্য হয়েই থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন যে তিনি মাতৃগর্ভে থাকতেই নাম করতেন। তাঁর জীবনীর ৮৩ পৃষ্ঠা দেখুন। বলেছেন—"জানি নামই আমার basis (ভিত্তি) তাই মাতৃগর্ভে থাকতেই আমি নাম করতাম।" কি ভাবে সূর্য্যের মধ্য দিয়ে আলোকধারা হয়ে নেমে এসে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেছেন তাও বলেছেন। যিনি জন্মের পূর্ব্ব থেকেই নামকে ভিত্তি করে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁর আবার অন্য গুরুর নিকট যাওয়ার আবশ্যকতা কোথায়? তিনি নিজেই তো গুরু পুরুষোত্তম। তাঁর ভাবধারা ও কার্য্যকলাপ তাঁর নিজের মতই। তাঁর তুলনা তিনিই।

যখন তাঁর মহাভাব হতো তখন জননীদেবী ভীত হয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবাবস্থার কথা সরকার সাহেবকে (চতুর্থ গুরুকে) জানিয়েছিলেন; তার উত্তরে সরকার সাহেব জননীদেবীকে আদেশ করেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দীক্ষা দেওয়ার জন্য। সেই আদেশ অনুযায়ী জননীদেবী শ্রীশ্রীঠাকুরকে ব্যবহারিক ভাবে দীক্ষা দিয়েছিলেন। সেই থেকে



স্বামীজী মহারাজ



হুজুর মহারাজ



মহারাজ সাহেব



সরকার সাহেব

শ্রীশ্রীঠাকুর সরকার সাহেবকে গুরু বলে স্বীকার করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সকল গুরুদিগকেই তিনি মানেন ও শ্রদ্ধা-ভক্তি করেন। তবে তাঁর ভাবধারা ও কার্য্যকলাপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুদিগের মত সর্বতোভাবে যে মিলবেই এমন আশা করা ভুল। শুনেছি জননীদেবীর নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর শ্রীশ্রীঠাকুর মাকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন "এসব তো আমি জানিই, নূতন কিছু দেওয়ার থাকে তো দে।"

স্বামীজী মহারাজের গদ্য "সার বচন" পড়েও তো স্পষ্ট বুঝা যায় যে সব গুরুদিগের ভাবধারা ও কার্য্যকলাপ একরকম হতে পারে না (সার বচন ১৪৯ ও ১৯৮ দেখুন)। তিনি লিখেছেন যে 'সন্ত কাহারও কয়েদী নন, যে সময় যা মঙ্গল ও প্রয়োজন বলে বোধ হবে তাই করবেন। যে মানবে তার লাভ হবে। আর যে অমান্য করবে তার ক্ষতি হবে। সন্তের দরবারে সেবা, ভজন ও সৎসঙ্গের একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই" ইত্যাদি। হিন্দী বচন দুইটি নিম্নে উদ্ধৃত করলাম ঃ

(১) বচন ১৪৯ ঃ "সন্ত কিসিকে কয়েদী নহী হ্যায় জিস্‌বক্ত জো মসলহত আউর মুনাসিব জানতে হ্যায় ওহী রাস্তা জারী ফরমাতে হ্যায়; জো মানেঙ্গে উন্‌কো ফায়দা হোগা, আউর জো নহী মানেঙ্গে উহ অভাগী রহেঙ্গে।..."

(২) বচন ১৯৮ ঃ "সন্তোকে দরবার মে কোই কায়দা খাস সেবা, ভজন আউর সৎসঙ্গকা মুকরর নহী হ্যায়, আউর ন সন্ত কিসিপর জবরদস্তি করতে হ্যায়, সির্ফ বচন সুনার্কর দুরস্তী করতে হ্যায়।"

তা হলে এখন বেশ বুঝা গেল যে এক গুরুর ভাবধারা ও কার্য্যকলাপ অপর গুরুর ভাবধারা ও কার্য্যকলাপের সঙ্গে যে মিলতেই হবে তার কোন কারণ নাই।

উপরে যে গুরুমুখের কথা বলা হলো, "গুরুমুখ" কাকে বলে তাই বলছি। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "গুরুমুখ সেই, যার সমস্ত প্রবৃত্তি সক্রিয়ভাবে গুরুতে কেন্দ্রীভূত।" হিন্দী গদ্য 'সার বচনে' আছে ঃ "গুরুমুখ ওহী হ্যায় জো সদ্‌গুরুকে হুকুম মে বর্ত্তে, হুকুম সে বাহর ন হোয়ে" অর্থাৎ সে-ই গুরুমুখ যে সদ্‌গুরুর হুকুম মত চলে, হুকুমের বাহির না হয়! (বচন ১৫২)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দীক্ষা ও আসন

দীক্ষা

আমাদের দেশে (ভারতে) পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে তত্ত্বদ্রষ্টা ঋষিরাই দীক্ষা দিতেন। তাঁরাই ছিলেন গুরু। অন্য কেহ দীক্ষাদানের অধিকারীই ছিলেন না। কালক্রমে তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষদিগের অভাব হতে আরম্ভ হলো, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা দীক্ষা দিতে লাগলেন। ক্রমশঃ ক্রমশঃ এই দীক্ষা দেওয়াটা অর্থাৎ গুরুগিরি করাটা বংশের পেশার মধ্যে পরিণত হয়ে গেল। এখন দীক্ষা দেওয়ার কার্য্যটা যেন তাঁদের বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কি ছিল আর কি হলো! শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞ [তত্ত্বদ্রষ্টা] পুরুষদিগের নিকটেই দীক্ষা লওয়ার আদেশ আছে। তত্ত্বজ্ঞ গুরু আজকাল খুব বিরল। সাধনে কিছুদূর আগ্রসর এমন দু'দশটি গুরু অনুসন্ধান করলে পাওয়া যেতে পারে, নচেৎ সবই সাধারণ কুলগুরুগণই দীক্ষা দিয়ে থাকেন, তার ফলে প্রকৃত জ্ঞান যা লাভ হবার কথা, তা তো হয়ই না বরং একটা কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে শিষ্যেরা উপযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সন্ধান পেলেও [কুলগুরু ত্যাগের ভয়ে] সেখানে দীক্ষিত হতে সাহস পান না। এই হয়েছে আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা। দেশের দুর্ভাগ্য! এ সম্বন্ধে আমি একটা ছড়া

লিখেছি। ছড়াটা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

১। তত্ত্বদ্রষ্টা দীক্ষাদাতা, ছিল পুরাকালে।
তাঁদের আসন করলে দখল, কুলগুরুর দলে।।
২। কুল বলতে বংশ বুঝে, কুলগুরুর দল।
গুরুগিরিই বংশের পেশা, করেছে সম্বল।।
৩। কুল অর্থে বংশ নয়, ব্রহ্ম সনাতন*।
ব্রহ্মজ্ঞরাই কৌলগুরু** ছিলেন তখন।।
৪। তাঁরাই ছিলেন দীক্ষাদাতা, জীবের হিতকারী
(এখন) ব্রহ্মজ্ঞানের ধার ধারেনা, (সব) করছে গুরুগিরি।।
৫। গুরুগিরির গুরুদায়িত্ব, নহে ত ছেলেখেলা।
ব্যতিক্রমে ডোবে পাপে, সঙ্গে নিয়ে চেলা।।
৬। এক অন্ধ পথ দেখাচ্ছে, অপর অন্ধ জনে।
ফাঁকির খেলা চলছে দেশে, বুঝে দেখ মনে।।

যাঁদের উদ্দেশে এই বইখানা লেখা হচ্ছে তাঁরা সকলেই দীক্ষিত, এবং ঋত্বিকদিগের নিকট দীক্ষা সম্বন্ধে সবই শুনেছেন, কাজেই এখানে বিশেষ করে কিছু লেখার আবশ্যকতা দেখিনা। বর্ত্তমানে ঋত্বিকেরাই দীক্ষা দিতেছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে দীক্ষা দেন না।

* মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে—
"ন কুলং কুলামিত্যাহু
কুলং ব্রহ্মসনাতনম্।।"
অর্থাৎ বংশকে কুল বলে না, সনাতনব্রহ্মাই কুল।

** কৌল ব্যক্তিই সকল মন্ত্রের অধিকারী এবং তিনিই নিখিল মন্ত্রের পারগ ও দীক্ষাগুরু বলিয়া খ্যাত। শ্লোক যথা ঃ
কুলীনঃ সর্ব্বমন্ত্রাণামধিকারীতি গীয়তে
দীক্ষাগুরুঃ স এব স্যাৎ সর্ব্বমন্ত্রস্য পারগঃ।

শুনেছি সর্বপ্রথমে তিনি নিজে খুব অল্পসংখ্যক লোককে দীক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর অনন্ত মহারাজ (৺অনন্তনাথ রায়) শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করার পর থেকে তিনিই শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে দীক্ষা দিতেন। ক্রমে দীক্ষাদানের উপযুক্ত সৎসঙ্গীগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে দীক্ষা দিতে থাকেন। তখন পাঞ্জা ছিল না। বর্ত্তমানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পাঞ্জাধারী ঋত্বিকের সংখ্যা অনেক, তাঁরাই জেলায় জেলায় এই নাম প্রচার ও দীক্ষাদানের কার্য্যে ব্রতী আছেন।

সাধারণের মধ্যে অনেককে বলতে শুনা যায় যে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে দীক্ষা দেন না, ঋত্বিকের দ্বারা দীক্ষা দেওয়ানো হয়, এটা কিন্তু শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। ঋত্বিকেরা শ্রীশ্রীঠাকুরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত, তাঁরই আদেশে ঋত্বিকেরা দীক্ষা দিয়া থাকেন সুতরাং তাঁদের দেওয়াটা শ্রীশ্রীঠাকুরেরই দেওয়া বুঝতে হবে। দীক্ষাদাতা ঋত্বিকদিগের ও দীক্ষাগ্রহণকারীদের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নাই। ঋত্বিকেরা গুরুর আজ্ঞাবাহক ও প্রতিপালক মাত্র। উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্য ভাব পোষণ অবিধি ও ক্ষতিকর। তবে দীক্ষাগ্রহণকারী শিষ্য দীক্ষাদাতা ঋত্বিককে বড় ভাই বা শিক্ষকের ন্যায় আদর সম্মান দিবেন। দীক্ষাদাতা ঋত্বিকদিগেরও খুব সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য যেন কোন প্রকারে মনে গুরুভাব না আসে, এবং দীক্ষাগ্রহণকারীর নিকট সেবা, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি পাওয়ার আশা না রাখেন। অন্যথায় বিশেষ ক্ষতি।

দীক্ষাদাতা ঋত্বিক মনে গুরুভাব পোষণ করে অধঃপতিত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছেন এরূপ ঘটনা বিরল নয়। ঋত্বিকদিগের দায়িত্ব সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা বাণীর কতকাংশ 'অমিয়বাণী' পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে উদ্ধৃত করা হলো ঃ—

...যাঁরা সদ্‌গুরুর আদেশে অর্থাৎ communion with Supreme Being established হয়েছে তাঁরই আদেশে তাঁকে দীক্ষাগ্রহণকারীর অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে, বেশ করে বুঝিয়ে দিয়ে—যে সেই সদ্‌গুরুই

ঐ দীক্ষাগ্রহণকারীর গুরু আর দীক্ষাদাতা বড় গুরু-ভ্রাতা ছাড়া কিছুই নয়, এমনকি কর্ম্মবিপর্য্যয়ে তিনি অর্থাৎ ঐ দীক্ষাদাতা যদি গুরু হইতে সরিয়াও যান তাহা হইলেও ঐ দীক্ষাগ্রহণকারীকে কোন প্রকার বিচলিত করিতে না পারে এমনতর ভাবে দীক্ষা দেন, তাদের কতক রক্ষা। কিন্তু যারা নিজেই গুরুগিরি করে, তারা আরও অধঃপাতে যায়। শিষ্যের দোষাদি গুরুতে সংক্রামিত হয় এবং গুরুর গুণ থাকলে তাহা শিষ্যে যায়।

ব্রাহ্মণ জাতটা অধঃপাতে যাবার—নিজ আদর্শে বা গুরুতে অটুট ও আপ্রাণ না হয়ে এই গুরুগিরি একধার থেকে করে যাওয়াও একটা কারণ। 'অমিয়বাণী' দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকে ১৩ পৃষ্ঠা থেকে ১৫ পৃষ্ঠায় প্রচারকদিগের চরিত্র কি প্রকার হওয়া উচিৎ তার বর্ণনা দিয়েছেন, ঐগুলিও দ্রষ্টব্য। এক স্থানে বলেছেন ঃ

"আপনাদের এক একটা দ্বিতীয় 'আমি' হতে হবে" (পৃষ্ঠা ২০)

উপযুক্ত শিষ্যের দ্বারা দীক্ষা দেওয়ার রীতি পশ্চিম প্রদেশের গুরুদিগের দরবারেও প্রচলিত আছে। তবে উহা ব্যক্তিগত ভাবে অর্থাৎ on individual application।

সদ্‌গুরু মঙ্গলময়। তিনি যা মঙ্গল বলে বোঝেন তাই করেন। জীবের হিতের জন্যই তিনি দেহ ধরে আসেন। সুতরাং তাঁর কথা অবিচারে মেনে চলাই জীবের কর্ত্তব্য। হিন্দী শব্দে আছে ঃ

"গুরু যো করে, সো হিতকর জান।
গুরু যো কহে, সো চিতধর মান।।"

অর্থাৎ গুরু যা করেন তা মঙ্গলপ্রদ বলে জেনো, এবং গুরু যা বলেন তা চিত্তে মেনে নিও।

অনেকে আবার এমনও বলে থাকেন যে এই "রাধাস্বামী" নাম হিন্দুশাস্ত্রে নাই, এ নাম অশাস্ত্রীয়। আমাদের শাস্ত্রগুলি পূর্ব্ব যুগের।

সন্ত-শাস্ত্রে দেখা যায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সন্তেরা আসেননি। তাঁরা এই কলিযুগে জীবকে পূর্ণ বা চরম জ্ঞান ও চরম মুক্তি দেওয়ার জন্যই আসেন। কাজেই তাঁদের শাস্ত্র পরবর্ত্তী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের শাস্ত্রে এ নাম থাকা সম্ভব নয়। আগে অবতার পুরুষেরা আসেন, পরে তাঁদের শিক্ষা, উপদেশ ও শাসনবাক্য নিয়েই তো শাস্ত্র প্রস্তুত হয়। সন্তেরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে না আসা হেতু পূর্ব্ব যুগের শাস্ত্রে এ নাম নাই। কলিযুগে তাঁরা এসেছেন, তাঁদের শাস্ত্রে এ নাম আছে। সুতরাং এ নাম অশাস্ত্রীয় নয়।

আমাদের এই সাধনপ্রণালীর দীক্ষাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ

(১) প্রাথমিক দীক্ষা (Preliminary)

(২) চরম বা চূড়ান্ত দীক্ষা (Final)

প্রাথমিক দীক্ষার সময় কেবল নামের ও ধ্যানের বিধি বলে দেওয়া হয়। এই প্রাথমিক দীক্ষাকে হিন্দী ভাষায় "ধ্যান সুমিরণ" বলে। সুমিরণ অর্থে নামজপ।

চরম বা চূড়ান্ত দীক্ষার সময় ভজনের প্রণালী দেখিয়ে দেওয়া হয়। ভজন অর্থে শব্দ-যোগ অভ্যাস।

নাম ও ধ্যান ভাল রকম অভ্যাস না হলে ভজন দেওয়া হয় না। নাম ও ধ্যান করতে করতে যখন ভজন পাওয়ার অবস্থা আসে তখন ভজন দেওয়া হয়। এই অবস্থা আসার পূর্ব্বে ভজন দিলে কাজ হয় না। ভজন দেওয়া আর না দেওয়া উপদেষ্টার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি যখন ভজন দেওয়া উপযুক্ত মনে করেন তখন দেন। অভ্যাসীদিগের ব্যস্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁদের লক্ষ্য যেন থাকে কিসে নাম ও ধ্যান ভাল হয়।

অন্যান্য মতের দীক্ষার ন্যায় এই মতের দীক্ষা দেওয়ার কোন আচার-অনুষ্ঠান বা বাহ্যাড়ম্বর নাই। যে-কোন সময়ে দীক্ষা হতে পারে, কেবল গৃহীতা এই মতটা ভাল করে বুঝে মনকে পবিত্রভাবে দীক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত করলেই দীক্ষা পেতে পারেন।

আসন

সাধনপ্রণালীর প্রথম অঙ্গ "আসন"। আসন বহু প্রকারের আছে, তার মধ্যে স্বস্তিক আসন ও পদ্মাসন প্রশস্ত।

স্বস্তিক আসনকে সাধারণ ভাষায় "আসন পিঁড়ে" বা "আসন গেড়ে" বসা বলে। সাধারণতঃ লোকে এই আসনে বসে থাকে। ইহা খুব সহজ। ইহাকে "সুখাসন"ও বলে। আর বাম পায়ের উরুতের উপর দক্ষিণ পা ও দক্ষিণ পায়ের উরুতের উপর বাম পা তুলে বসার নাম "পদ্মাসন"।

যে আসনে বিনা কষ্টে অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারা যায় সেই আসনে বসতে হয়। কষ্টকর কোন আসনে বসলে পায়ে যন্ত্রণা হয়, ফলে মন চঞ্চল হয়। সেরূপ আসনে বসা উচিৎ নয়। নির্জনে—যেখানে কোন গোলমাল নাই, কেহ দেখতে না পায় এমন একটি স্থানে বসা দরকার। শয়নঘরে দরজা বন্ধ করে বসতে পারা যায়। সৎসঙ্গী হলে একসঙ্গে কয়েকজন এক ঘরে বসতে দোষ নেই, তবে যাঁরা ভজন পেয়েছেন ভজন না-পাওয়া সৎসঙ্গীর সঙ্গে এক ঘরে তাঁদের বসা নিষেধ। পৃথক বসা উচিৎ।

যে ঘরে বসা হবে সে ঘরটি যত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় ততই ভাল। আলো-বাতাস থাকে, কোন দুর্গন্ধ না থাকে, যেন ঘরে ঢুকলেই মন প্রফুল্ল হয় এমন হওয়া দরকার। সাধারণ গৃহস্থ সংসারীর পক্ষে

এমন একটা পৃথক ঘর যোগাড় হওয়া মুস্কিল, তবে যতটা পারা যায় ভজন-ঘর পরিষ্কার রাখাই উচিৎ। বসবার পূর্ব্বে (অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে) ঘরে ধূপ-ধুনা দেওয়া ভাল।

যাঁর যে আসনে বসলে সুবিধা হয় তিনি সেই আসনে বসতে পারেন। বেশ পুরু কোমল আসনে বসা দরকার, যাতে অনেকক্ষণ বসে থাকলে যন্ত্রণা না হয়। বেশ পুরু করে কম্বল বা অন্য কোন কোমল বিছানা পেতে মশারী খাটিয়ে তার মধ্যে বসা যেতে পারে, তা হলে মশা, মাছি প্রভৃতি বিরক্ত করতে পারে না।

প্রত্যহ এক ঘরে ও ঘরের এক স্থানে এবং এক সময়ে নিয়ম করে বসা ভাল। প্রত্যহ স্থান ও সময় পরিবর্ত্তন করা ভাল নয়। নাম ও ধ্যানাদি অভ্যাস পরিপক্ক হয়ে গেলে কোন নিয়মের আবশ্যকতা থাকে না।

নাম, ধ্যান, বা ভজন করবার সময় মাথা, ঘাড় ও মেরুদণ্ড সরল ও সোজা করে বসে একখানা চাদর কি কাপড় ঢাকা দিয়ে বসা বিধি।

ভজনের আসন পৃথক, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। আসন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর ভাববাণীতে বলেছেন ঃ

> "যেমন তেমন আসন করে বসতে পারিস। শিরদাঁড়াটা সোজা হলেই হলো। খুব একটা মোলায়েম আসনে পদ্মাসনে বা যে কোন আসনে সুখ হয়, বসে কুটস্থে মনটা ফেলে দিয়ে শিরদাঁড়াটা সোজা করে নামটা জপ করিস, অমনি কিছু দিন করতে করতে শব্দ পাওয়া যায়।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাধাস্বামী নাম

শাস্ত্রে নাম আর নামী অভেদ, এই কথা বলা হয়েছে। যেমন ঃ বৈষ্ণবেরা বলেন "যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি, নামের সহিত ফেরেন আপনি শ্রীহরি।" বাইবেলে আছে ঃ "There was word, the word was with the God, the word was God" অর্থাৎ শব্দ (বাক্য) ছিল, ঈশ্বরের সহিত বাক্য ছিল, বাক্যই ঈশ্বর। বেদ বলেন শব্দ ব্রহ্ম। হিন্দী পুস্তকে বলছে ঃ গুপ্তরূপ যাঁহা ধারিয়াঁ "রাধাস্বামী" নাম অর্থাৎ রূপ গুপ্ত ছিল "রাধাস্বামী" নামরূপে প্রথম প্রকাশ। যাই হোক, সব শাস্ত্রই শব্দের কথা বলেছে। এই শব্দগুলিকে অনাহত নাদ বলে; যেমন ওঁ, হ্রীং, ক্লীং, রং ইত্যাদি। সৃষ্টির ও দেহের প্রতি স্তরে এক একটা শব্দ আছে, সেই শব্দগুলি বীজরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

"রাধাস্বামী" **নাম** আদি নাম। হিন্দী পুস্তকে এই নামের অর্থ ঃ স্বামী অর্থে চৈতন্যের ভাণ্ডার যাঁকে পরম পুরুষ বা পরম কারণ বলা হয়, আর "রাধা" হলো তাঁর ধারা (Current) যা পরম পুরুষ থেকে নির্গত হয়ে মণ্ডল সৃষ্টি করেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাববাণীতে বলেছেন ঃ—

"I am spirit, my current is Radha."

অর্থাৎ আমি চৈতন্য, আমার ধারাই রাধা।

"এক আধদিন try কর R.S. নাম Real
এর যতদূর নকল হতে পারে।"

আর এক স্থানে বলেছেন ঃ

"ওঁ ছাড়িয়ে যেতে হবে।
ওঁ তো কাছেই। ঐ পার হলেই
ক্রমে ক্রমে "রাধাস্বামী"।

মহারাজ সাহেব হিন্দী পুস্তকে বলেছেন ঃ

"রাধাস্বামী" নাম মালিককে স্বরূপ কো"
"কি জিস্ তরহ্ কাররাওয়াই কররহাহ্যায়"
"এক লফ্জমে বতাতা হ্যায়"।

অর্থাৎ, এই নাম মালিকের স্বরূপের কি ভাবে কার্য্য হচ্ছে এক কথায় প্রকাশ করছে। ইঁহারই ইংরাজী পুস্তক 'Discourse on Radhasoami faith'-এ আছে ঃ এই নাম nearest approach to that name।

এই আদি নাম বা বীজ থেকে অন্যান্য বীজের উৎপত্তি হয়েছে। যতদিন এই আদি নাম না ধরা যায়, ততদিন আদি পদে পৌঁছান যায় না। পূর্ণ মুক্তিও হয় না। অন্যান্য নাম তাদের নিজ নিজ উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, আদি পদে পৌঁছে দিতে পারে না।

সৃষ্টির আদিতে অনামী কম্পনের দ্বারা যেরূপ সৃষ্টিক্রিয়া চলছে সেইরূপ কম্পন জিহ্বাতে ও মনে দিতে হলে "রাধাস্বামী" এই শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত অন্য কোন নামে সেরূপ কম্পন সৃষ্টি করে না।

উপুরোক্ত বিষয়গুলি অনুভূতি দ্বারা নিজের বোধের মধ্যে না এলে ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। তবে বিষয়টা জেনে রাখা দরকার। 'অমিয়বাণী' দ্বিতীয় খণ্ডে (৫৬ পৃঃ থেকে ৬১ পৃঃ) শ্রীশ্রীঠাকুর এই

বিষয়ে আলোচনার উত্তরে যা যা বলেছেন পড়ে দেখলে অনেকটা বোধগম্য হতে পারে।

"রাধাস্বামী" নাম উচ্চারণ করতে হয় "রাধাসোয়ামী" বলে। "স্বামী" বলে নয়, "সোয়ামী" (Radhasoami) বলে। সৎসঙ্গীদিগের মধ্যে কেহ কেহ রাধাস্বামী বলতে "শ্রীকৃষ্ণ" এই ভাব পোষণ করেন, সেটা কিন্তু ভুল। এ সম্বন্ধে ঋত্বিক দাদারা দীক্ষা দেওয়ার সময় যেন ভাল করে দীক্ষাগ্রহণকারীকে বুঝাইয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ তো নরদেহধারী অবতার পুরুষ, আর "রাধাস্বামী" হচ্ছে আদি নাম বা বীজ। আর একটা কথা, কয়েক বৎসর আগেকার কথা বলছি। প্রায় ৪/৫ বৎসর আগে কতকগুলি সৎসঙ্গীদিগের মধ্যে "নাম, ধ্যান করা দরকার নাই, শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ করলেই হয়" এই রকম একটা ভাব জেগেছিল। সেটা মস্ত বড় ভুল। নামধ্যানই তো মস্তিষ্কের কোষগুলি প্রস্ফুটিত করে, সাড়াপ্রবণ করে, গ্রহণক্ষম করে, কর্ম্মক্ষম করে, ইষ্টপ্রাণতা বৃদ্ধি করে। ওসব ছেড়ে দেওয়া উচিৎ তো নয়ই—বরং যত বেশী করা যায় ততই ভাল। ইষ্টের প্রতি ভালবাসাটাই তো কর্ম্মের প্রেরণা দেয়। নাম, ধ্যান, ভজন সেবাদি যা-কিছু আমরা করি সকল গুলিরই উদ্দেশ্য হচ্ছে ইষ্টে প্রেম জাগানো, কাজেই ওসব বাদ দেওয়া চলে না।

সদ্‌গুরুর চরিত্র নিজের চরিত্রে প্রতিফলিত করতে হবে, সক্রিয় চেষ্টায় নিজের মধ্যে কায়েম করতে হবে, তা সাধনার সহায়ক হয়। পূর্ব্বে বলেছি শ্রীশ্রীঠাকুর 'অমিয়বাণী' পুস্তকে বলেছেন যে, আপনাদিগকে এক একটা দ্বিতীয় "আমি" হতে হবে।

নাম-জপ ও ধ্যান

এই নাম-জপ করতে হলে নির্জ্জনে স্থির হয়ে সুখাসনে (বসবার বিধি আগে বলা হয়েছে) মেরুদণ্ড ঘাড় ও মাথা সোজা ও সহজ

করে বসে জপ করতে হয়। বসবার আগে ভাবপূর্ণ কীর্ত্তন, সদালোচনা ও সৎ গ্রন্থাদি পাঠ করে মনকে কোমল ও দীনভাবাপন্ন করে বসা ভাল।

নাম-জপ তিন প্রকারে করা হয় ঃ

(১) জিহ্বাদ্বারা—উচ্চারণ করে

(২) মন দ্বারা—মনে মনে

(৩) সুরত দ্বারা—প্রতি প্রাণস্পন্দনে

সুরতের দ্বারা নাম-জপ আমরা জানিনা। মনে মনে নাম জপ করতে করতে আপনা আপনি সুরতে (Vital Current-এ) নাম পড়ে, তখন আর চেষ্টা করে নাম করতে হয় না। প্রতি প্রাণস্পন্দনে নাম হতে থাকে। প্রকৃত নাম পাওয়া তাকেই বলে।

মনটাকে তেসরাতিলে জমিয়ে একাগ্র করে concentrated করে, তালে তালে নাম করতে হয় অর্থাৎ Rhythm-টা (তালটা) যেন ঠিক থাকে, একবার দ্রুত একবার ধীরে এমনতর না হয়। জিহ্বা বা ঠোঁট নড়বে না, মনে মনে নাম জপ করতে হয়। তাকিয়ে বা চোখ বন্ধ করে নাম করা চলে, তবে নাম করতে করতে আপনা আপনিই চোখ বুঁজে আসে। তেসরাতিলে মনোযোগ রাখতে হয়। মনটাকে সেখানে নিয়ে যেতে অনেকে চোখের পুতলিদুটোকে টেনে উল্‌টে নিয়ে যেতে চায়। জোর করে সেরকম করার দরকার নেই। তাতে শিরঃপীড়া হতে পারে। সহজ ও সরলভাবে মনটাকে তেসরাতিলে বসাবে, মনের চোখে দেখবে, মনের কানে শুনবে। সুরত স্বয়ং আকর্ষণ স্বরূপ, কেন্দ্রের সম্মুখীন হলেই অন্তরে প্রবেশ করবে। চুম্বক যেমন লোহাটাকে টানে সেইরকম শব্দধারা সুরতকে টেনে নেবে। অভ্যাসীদের কেবল কেন্দ্রের সম্মুখীন হওয়া দরকার।

অন্ততঃপক্ষে একঘণ্টাকাল প্রাতে ও একঘণ্টা সন্ধ্যায় বসা উচিত। তারপর ধীরে ধীরে সময় বাড়াতে হয়। নিয়ম করে বসতে হয়, বাদ দিতে নাই। নির্দ্ধারিত সময়ে (সকাল ও সন্ধ্যা) ব্যতীত অন্য সময়েও যতদূর পারা যায়, সকল কাজের মধ্যে নাম করতে হয়। মন স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখী, বাহিরে যাওয়া তার স্বভাব। বেরিয়ে গেলে ধরে এনে পুনঃ পুনঃ লক্ষ্যে যুক্ত করতে হয়। এই রকমে অভ্যাস করতে করতে মন ক্রমশঃ স্থির হতে আরম্ভ করলে তখন নাম করতে ভাল লাগবে। সমস্ত দিনে দুই বারের বেশী (তিন অথবা চার বার) বসা চলে।

অনভ্যাসবশতঃ মন নামে ও ধ্যানে বেশীক্ষণ লেগে থাকতে চায় না, অবান্তর চিন্তা নিয়ে আসে, সুতরাং নিয়মিত বসা ছাড়াও দিন রাত্রের মধ্যে সময় পেলেই যতবার পারা যায় (২/১০ মিনিট হোক ক্ষতি নাই) বসা ভাল, তাতে অভ্যাস দুরস্ত ও পাকা হয়ে আসে। মন স্থির করা মানে—বহু চিন্তা থেকে মনকে সরিয়ে এনে একে—ইষ্টে যুক্ত করা।

নাম করার সময় মন চঞ্চল হয়ে যদি বহির্ম্মুখী হয় এবং অন্য বিষয় চিন্তা করতে থাকে তাহলে কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ ১০/১৫ মিনিট এই নামকে ৪ ভাগে বিভক্ত করে ক্রমান্বয়ে নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও আজ্ঞাচক্রে মনে মনে জপ করতে হয়। অর্থাৎ—

নাভিতে	হৃদয়ে	কণ্ঠে	আজ্ঞাচক্রে
রা	ধা	সোয়া	মী

এইভাবে খানিকক্ষণ জপ করতে করতে মন কতকটা স্থির হয়ে আসবে, তখন আবার পূর্ব্বের ন্যায় তেসরাতিলে জপ করবে। উপরোক্ত প্রকারেও যদি মনের চঞ্চলতা না যায়, তাহলে উচ্চারণ

করে নাম করবে, তাতে মন থেকে সংসারী চিন্তা কতক পরিমাণে দূর হলে, পুনরায় মনে মনে নাম করবে, তাতেও যদি মন না বসে, তাহলে নাম বন্ধ করে ভাবপূর্ণ স্তব পাঠ বা কীর্ত্তন করবে। পরে অবসর মত আবার বসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন যে নাম ও ধ্যানের সময় যদি একঘণ্টা পাওয়া যায়, তাহলে একঘণ্টার মধ্যে ৪৫ মিনিট মনকে স্থির করতে লাগে। বাকী ১৫ মিনিট মাত্র নাম করা হয়। একঘণ্টা বসা হলো বটে, কিন্তু বাজে চিন্তাতেই সময় কেটে গেল। ঐ সকল বাজে চিন্তাতে যেন অবশ করে অজ্ঞাতসারে মনটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

আমাদের মন চিরন্তন অভ্যাসবশতঃ সংসারী চিন্তাতে অনায়াসে তদ্ভাবিত হয়ে পড়ে, ডুবে যায়। আমরা সাধারণতঃ বহু সাংসারিক বিষয় চিন্তা করার পর সেই সকল সাংসারিক চিন্তার ধারা নিয়ে জপে বসি, ফলে নাম ও ধ্যানের সময় সেইসব সংসারী চিন্তার তরঙ্গ উঠতে থাকে, তাই জপে বসার আগে কিছুক্ষণ সৎসঙ্গ বা গুরুর মহিমাপূর্ণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা মনকে সংসারী চিন্তা থেকে মুক্ত করে জপে বসতে হয়, তাহলে নামে ও ধ্যানে সহজেই রস পাওয়া যায়। দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় যদি (সন্ন্যাসীদের ধুনী জ্বেলে রাখার মত) সমস্ত কাজের মধ্যে নাম জাগিয়ে রাখা যায় ও মনটাকে ভাবমুখী করে রাখা যায় তাহলে বসামাত্রই রস ও আনন্দ পাওয়া যেতে পারে, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন ঃ

"নামের চাকা সব কাজের মধ্যে
ঘুরবে তবে তো?"

নাম ও ধ্যান একসঙ্গে করতে পারলে ভাল হয়। নচেৎ পৃথকভাবে করা চলে। প্রথমে অনেকক্ষণ ধরে নাম করার পর ধ্যান করতে হয়।

কিছুদিন এইরকম অভ্যাস করলে নাম ও ধ্যান একসঙ্গে করবার ক্ষমতা জন্মায়। তখন নামের সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানও হতে থাকে।

নাম ও ধ্যানের সময় মনটাকে শিথিল (free) করে দিতে পারলে সহজে একাগ্রতা আসে। শিথিল করা মানে—ঢিল দেওয়া, বা আউলে বা এলাইয়া দেওয়া। এটা কিন্তু নির্ভর করে ভাবের উপর। যার মন যত ভাবমুখী তার মন তত সত্বর শিথিল ভাব ধারণ করে। মনের এই অবস্থাটা আনবার জন্য মনটাকে প্রথমে সকল চিন্তা থেকে খালি (vacant) করার চেষ্টা করতে হয়, অর্থাৎ সমস্ত চিন্তা ছেড়ে দিতে হয়। মন কিন্তু একটা অবলম্বন ব্যতীত থাকতে পারে না, তাই অন্য চিন্তা থেকে মনকে খালি করলেই সে একটা অবলম্বন খোঁজে, আর সেই সময় মনকে নাম ও ধ্যান ধরিয়ে দিতে হয়, তখন মন যেন আশ্রয়হীন অবস্থায় আশ্রয় পেয়ে তাতে যুক্ত হয়। তবে নাম ও রূপে প্রীতি থাকা আবশ্যক। প্রিয়তমের প্রতি ভালবাসা বা টান যার যত বেশী, তার মন তত তাঁর দিকে ছোটে, আর তাঁর ভাবে ভাবিত হয়ে অন্য চিন্তা ত্যাগ করে। মানুষ যে-কোন কাজ করে ঐ করার একটা কায়দা বা যুত সে খুঁজে বের করে, যাতে ঐ কাজ সহজে করা যায়! সেইরকম নাম ও ধ্যান করার যুত নিজে নিজে বের করে নিতে হয়। চেষ্টা করলেই হয়।

নামে মন নির্ম্মল করে অর্থাৎ মনে যত সংস্কার রাশি আছে সেগুলি নামের সঙ্গে মূর্ত হয়ে তরঙ্গরূপ হয়ে কেটে যায় এবং মন নির্ম্মল হওয়া হেতু ধ্যানও ভাল হয়। জলে তরঙ্গ থাকলে যেমন জলের নীচেকার পদার্থ দেখা যায় না, সেইরকম মনে ময়লা থাকলে অর্থাৎ বহু বিষয়ের চিন্তা থাকলে ধ্যান হয় না, তাই নাম যত বেশী করা যায় ততই ভাল। নামে ও ধ্যানে মস্তিষ্কের স্নায়ুশক্তি (nerves) উত্তেজিত করে কোষগুলিকে সাড়াপ্রবণ ও গ্রহণক্ষম (Sensitive and Receptive) করে; তাতে ধারণাশক্তি বেড়ে যায়।

ধ্যান

ধ্যান মানে—কোন একটা কিছুর চিন্তা নিয়ে লেগে থাকা। তেসরাতিলে সদ্‌গুরুর প্রেমময় মূর্ত্তিখানি ধ্যান করতে হয়। সদ্‌গুরুমূর্ত্তি ধ্যানে আনা কঠিন। মায়িক যে-কোন মূর্ত্তি ধ্যান কর, সহজেই তার রূপ মনে উদয় হয় কিন্তু সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ সদ্‌গুরু মূর্ত্তি মায়িক নয়। তাঁকে ধ্যানে আনা কঠিন। মনের একাগ্রতা ও উর্দ্ধগতি (Concentration and Elevation) না হলে প্রকৃত ধ্যান হয় না, দর্শনও হয় না। ৺অনন্ত নাথ রায় (মহারাজ) তাঁর 'সান্ত্বনা' পুস্তকে লিখেছেন :

> "যখন জীব তাঁর অপার করুণায় এই সত্যনামের সন্ধান পায় এবং নাম গ্রহণ করে, তখনই তিনি সদ্‌গুরু রূপে তার তেসরাতিলে চিরজীবনের মত অধিষ্ঠিত থাকেন। তোমার অন্তরে সেই নির্দ্দিষ্ট ধ্যানের স্থানে তাঁকে খোঁজ কর তাহলে তার দর্শন লাভ হবে।"

ভাববাণীতে আছে :

> "দ্বিদলে গুরুরূপী আমাকে দেখ
> আর মনে মনে জপ কর।"

মহারাজ সাহেব হিন্দী পুস্তকে লিখেছেন :

"ধ্যান বেঠিকানে না হোয়ে" অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট স্থানে যেন ধ্যান না হয়।

সদ্‌গুরুমূর্ত্তির সবখানিই (আপাদমস্তক) ধ্যেয়, তার মধ্যে মুখ শ্রেষ্ঠ এবং মুখের মধ্যে চোখ আর কপাল শ্রেষ্ঠ।

ধ্যানের নির্দ্দিষ্ট স্থান তেসরাতিল সম্বন্ধে অনেকে বলে থাকেন যে, ঐ স্থান ঠিক করা যায় না, হাঁতড়ে বেড়াতে হয়। তেসরাতিল হলো দুই চোখের মাঝখানে অর্থাৎ নাকের গোড়া (ভাঙ্গাস্থান) থেকে প্রায় এক ইঞ্চি ভিতর দিকে। ঐ স্থানটা অনুমান করে ধরে নিতে হয়, অর্থাৎ দুই চোখ বন্ধ করে ঠিক দুই চোখের মাঝখানে মনের চোখ দিয়ে লক্ষ্য করতে হয়। আর তাতে যদি অসুবিধা হয়, তাহলে নাকের গোড়ায় (ভাঙ্গা স্থানে) বাহিরের দিকে গুরুমূর্ত্তি বসিয়ে ধ্যান করলেও মন ঠিক স্থানে ভিতর দিকে আপনা আপনি প্রবেশ করে। বাহিরে যেমন গুরুর সম্মুখে বসে থাকা যায়, সেইরকম তাঁকে সহজ ভাবে ধ্যানের স্থানে বসাতে হয়। এবং নিজেকেও সেখানে বসিয়ে মনে মনে মানস পূজা, সেবাদি করতে হয়। যতক্ষণ এইরকম করবে ততক্ষণ গুরুমূর্ত্তির ধ্যান হবে।

আগেই বলেছি, সদ্‌গুরুমূর্ত্তি ধ্যানে আনা কঠিন। অন্য যে-কোন মায়িক মূর্ত্তি সহজে ধ্যানে আসে, কিন্তু সদ্‌গুরুমূর্ত্তি আসে না, এবং যদি কখনও আসে, তা হয়তো আংশিকভাবে। হাত আসে তো পা আসে না, পা আসে তো মুখ আসে না, আর যা আসে তা তৎক্ষণাৎ সরে যায়, দাঁড়ায় না (always fleeting)।

আগেই বলেছি যে, নাম ও নামী অভেদ। বহির্জগতের যে-কোন বস্তুর বা ব্যক্তির নাম করলেই তার রূপটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, অন্তর্জগতে রূপ ফুটাতে হয়। বীজ থেকে রূপ ফোটে, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর দ্বিদলে দেখতে বলছেন।

ধ্যানের সময় সদ্‌গুরুর ফটোখানা (যে ফটো সদ্‌গুরুর জীবন্ত মূর্ত্তি স্মরণের সহায়ক) সম্মুখে রেখে স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ দেখার পর ধীরে ধীরে অন্তরে রূপটা নিতে হয়, তাতে তাঁর সজীব মূর্ত্তি

স্মরণে আসে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা স্মরণের ব্যবস্থা আছে। এই লীলা স্মরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে—লীলার নায়ক-নায়িকাকে স্মরণ করা। কারণ নায়ক-নায়িকাকে বাদ দিয়ে লীলার কোন অর্থ হয় না। সেইরকম সদ্‌গুরুমূর্ত্তি ধ্যানে না এলে তাঁর উঠা, বসা, শোয়া, দাঁড়ান, চলা ফেরা, হাসি, কথা কহা ইত্যাদি চিন্তা করলে সদ্‌গুরুমূর্ত্তি ধ্যানে আসে, কিন্তু তাঁকে ধ্যানে ধরে রাখাটা নির্ভর করে চিত্তের স্থৈর্য্য ও প্রাণের টানের উপর। যার উপর প্রাণের টান যতখানি, তার মূর্ত্তিও ততখানি চোখে ভাসে। তাই নাম, ধ্যান, বা ভজন যাই কর সকলের মূলে দরকার হচ্ছে বিশ্বাস, ভক্তি এবং প্রাণের একটা টান বা ব্যাকুলতা—তাঁকে পাওয়ার জন্য,—নচেৎ কেবলমাত্র অভ্যাসে ফল হয় না।

মহারাজ সাহেব হিন্দী পুস্তকে বলেছেন ঃ

"ছিন্‌ভরকী বেকলী সো বরষকী
অভ্যাস সে ভী বেহত্তর হ্যায়।"

অর্থাৎ শতবর্ষের অভ্যাস অপেক্ষা এক পলের ব্যাকুলতাও শ্রেষ্ঠ।

ফটো ধ্যান সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন ঃ

"মনের সবচেয়ে highest অবস্থা যৎকালে in communion with Supreme Being সেই অবস্থার ফটো ধ্যান করা ভাল অর্থাৎ যখন পরমপিতার সহিত যোগে থাকা হয় সাধারণতঃ তদবস্থার ফটোই ধ্যেয়।"

আবার বলেছেন ঃ

"যাদের Communion with Supreme Being established হয়েছে তাদের প্রতি ব্যাপারের, প্রতি অঙ্গভঙ্গির, প্রতি পদ-বিক্ষেপের সহিত সেই মার্কা মারা

supreme-এর তক্‌মা লাগাই থাকে; তাদের যে কোন কিছুতেই আসক্তি ও চিন্তা মানুষকে ক্রমনিয়ন্ত্রণে অনন্তস্পর্শী করে তুলতে পারে! যাঁদের পরমপিতার সহিত communion established হয়নি, এমন সাধকের ফটো ধ্যান করলে তাঁদের ক্ষতি করা হয়। তাই একটু আধটু সাধনে অগ্রসর হয়েই গুরুগিরি করা ভাল নয়।"

উপরোক্ত বাণী থেকে আমি এই বুঝি যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের যে-কোন অবস্থার ফটো ধ্যান করা যায়। তবে ধ্যান করতে হলে শুধু মূর্ত্তিটা নয়, তার সমস্ত ভাব নিয়ে করা দরকার। মূর্ত্তি বাদ দিয়ে তো ভাব ধ্যান করা চলে না! মূর্ত্তি থাকবেই, ভাব-সমেত।

নামের ও ধ্যানের দ্বারা মনের একাগ্রতা (concentration) হয়; মনের একাগ্রতা (concentration) হলে সুরতের জমাট (concentration) হয়। আর সুরতের জমাট (concentration) হলে তার চড়াই (elevation) হয়। এই চড়াই-এর সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানও ভাল হয় ও সুস্পষ্ট হতে থাকে। তবে একাগ্রতার (concentration-এর) তীব্রতা এতখানি হওয়া দরকার যতখানি হলে চড়াই (elevation) হতে পারে। বেলুনে বাষ্প প্রবেশ করলে বেলুন উপরে উঠে, কিন্তু বাষ্পের পরিমাণ ততখানি হওয়া দরকার, যতখানি হলে উপরে উঠতে পারে। সেইরূপ একাগ্রতার (concentration-এর) তীব্রতা ততখানি হওয়া দরকার, যতখানি হলে চড়াই (elevation) হয়।

চড়াই (elevation) অর্থে সুরতের জাগ্রত অবস্থা (position) ছেড়ে স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ঘাট পার হয়ে তুরীয় অবস্থায় এবং তার পরাবস্থায় যাওয়া।

নাম ও ধ্যান "করা" এক এবং নাম ও ধ্যান "হওয়া" আর এক কথা। উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। "করার" মধ্যে চেষ্টা আছে, "হওয়ার" মধ্যে চেষ্টা নাই। আপনা আপনিই হয়। করতে করতে হওয়ার অবস্থা (position) আসে। স্বভাবগত হলেই "হওয়া" হয়। আর হওয়াটা নির্ভর করে ভালবাসার উপর। তাই হিন্দী পুস্তকে আছে ঃ—

"বগৈর প্রীতকে ধ্যান নহী বন সক্তা ইস্‌লিয়ে
নামকে সুমিরণ পর জ্যাদা জোর দিয়া গয়া।
ধ্যান তব হোতা হ্যায় জব মালিক
ইয়া উস্‌কে অওতারকা দর্শন নরশরীর মে
হোতা হ্যায়। বগৈর দর্শনকে ধ্যান নহি
হোগা, আউর ন প্রেম আওয়েগা।
সচ্চী সচ্চী বাত তো এ হ্যায় কি কাম
তব বনেগা জব মোহনীরূপ সদ্‌গুরুকী ইস্‌কে
হিরদেমে প্রগট হোগা। ইত্‌নেমে কভী কভী
শব্দভী শুনাই দেগা, আউর রসভী আওয়েগা।।
মগর এইন্‌ করকে অন্তর দ্বারেমে তব প্রবেশ
করেগা জব সদ্‌গুরুকা মোহিনীরূপ প্রগট হোগা।
সদ্‌গুরুরূপ গোয়া ঘটকী তালা খোল্‌নে কা কুঞ্জি হ্যায়।"

অর্থাৎ ভালবাসা ব্যতীত ধ্যান হয় না; এই কারণে নাম জপের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। ধ্যান তখনই হয় যখন মালিক অথবা তার অবতারের দর্শন নরশরীরে হয়। দর্শন না হলে ধ্যান হয় না এবং প্রেমও জাগে না। প্রকৃত কথা এই যে, কাজ তখনই হয়, যখন সদ্‌গুরুর মোহিনী রূপ অভ্যাসীর হৃদয়ে প্রকাশ হয়। ইহার মধ্যে

কখন কখন শব্দ শুনা যায়, রসও আসে, কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে অন্তর দ্বারে তখনই প্রবেশ করে যখন সদ্‌গুরুর মোহিনীরূপ প্রকাশ হয়। সদ্‌গুরু মূর্ত্তি যেন দেহের তালা খুলবার চাবী।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাববাণীতে আছে ঃ

"ধ্যান করবি সকল সময়। চলতে, বসতে,
খেতে, শুতে, সকল সময়।"

হিন্দু পুস্তকে আছে ঃ

"খাতে, পিতে, চল্‌তে, ফিরতে।"
"সোয়াত, জাগত বিসরন জাত"

অর্থাৎ খেতে, পান করতে, চলতে, ফিরতে, শুতে, জাগতে বিস্মরণ হইও না।

নাম ও ধ্যান দ্বারা মনের একাগ্রতা (concentration) হলে দেহ হালকা বোধ হয়; মাথা ও চোখ ভারি হয়, চোখ ভিতর দিকে টানে, আপনা আপনি চোখ বুঁজে আসে, চোখ বুঁজে বসে নাম ও ধ্যান করতেই ভাল লাগে, অন্য বিষয় চিন্তা ভাল লাগে না এবং সামান্য সিদ্ধি (ভাং) খেলে যেমন অল্প অল্প নেশা হয়, সেইরকম নেশার মত হয়। মন সদা প্রফুল্ল থাকে, হৃদয়ের সদ্‌গুণের উদয় হয়। এ অবস্থাটা বড় আনন্দদায়ক, কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে নির্ম্মল অভ্যাস ও গুরুর প্রতি ভালবাসার উপর। এই অবস্থাতে মনের একাগ্রতা (concentration) গাঢ় হলে স্বপ্নাবস্থায় যেমন কত কি দর্শন হয় সেইরকম বায়স্কোপের ছবির মত অনেক রকম (manifestation) দর্শন হয়। নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বাগান, বাড়ী, মানুষ, দেব-দেবী প্রভৃতি কত কি নজরে আসে ও অনেক বাণী শুনা যায়। আবার ঐ সব দ্রুত সরে

যায়। এই সকল দর্শন ও শ্রবণ মনোহর হলেও তাতে আকৃষ্ট হতে নাই। ও সব আসবে, যাবে। অভ্যাসীর টান কিন্তু থাকবে কেবল তার লক্ষ্যের দিকে, অর্থাৎ গুরুর দিকে। কতক্ষণে ও কি উপায়ে প্রিয়তমের সেই মোহনী মূর্ত্তি দর্শন পাওয়া যায়, কেবল সেই চিন্তা। এইরকম করতে করতে প্রাণের ব্যাকুলতা বেড়ে গেলেই গুরু কৃপা করে তাঁর প্রেমময় মূর্ত্তিখানি প্রত্যক্ষ করান, তখন অভ্যাসী নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করে।

মনের একাগ্রতার (concentration-এর) গাঢ়তা ও স্থায়িত্বের পরিমাণ যত বেশী হয়, তত দর্শন স্পষ্ট, স্থায়ী ও আনন্দদায়ক হয় এবং সেই সঙ্গে শব্দও (অনাহত নাদ) খুলতে থাকে। এই শব্দগুলি যেন একাগ্রতার (concentration-এর) মাপকাঠি। যখন এই শব্দ খুলতে আরম্ভ করে, সেই সময় অভ্যাসীর অভ্যাসের সমস্ত অবস্থার (experience-এর) কথা বিস্তারিতভাবে গুরুকে জানানো কর্ত্তব্য, কারণ এরূপ অবস্থাতে অভ্যাসীকে প্রায়ই ভজনের উপদেশ দেওয়া হয়।

অনেকক্ষণ বসে নাম ও ধ্যান করতে করতে যদি কোমর ও পা ধরে আসে, পায়ে ঝিনঝিনি লাগে, পা কট্‌কট্‌ ঝন্‌ঝন্‌ করে, তাহলে আসনে বসে পা ছড়িয়ে দিতে হয়, না হয় আসন থেকে উঠে ঘরের মধ্যেই পা-চারি করে বেড়াতে হয়। এইরকমে একটু বিশ্রাম করে আবার বসতে হয়।

প্রায়ই দেখা যায় নামের ও ধ্যানের সময় তন্দ্রা আসে অনেকে তাকে একটা ছোট-খাট সমাধি অবস্থা বলে মনে করেন, কিন্তু সেটা "সমাধি" নয়, সেটা "লয়"। তন্দ্রাতে মাথা, ঘাড়, দেহ ঝুঁকে পড়ে। সমাধিতে তা হয় না—বাহিরে জ্ঞানের অভাব হলেও ভিতরে জ্ঞান

থাকে। তন্দ্রা এলে আসন থেকে উঠে একটু বেড়াতে হয়, চোখে মুখে জল দিয়ে আবার বসতে হয়। তন্দ্রা একটা বিঘ্ন।

এই বিঘ্ন ছাড়া আরও কয়েকটি বিঘ্ন আছে। তাদের নাম—(১) বিক্ষেপ, (২) কষায়, (৩) রসাস্বাদ।

(১) **বিক্ষেপ ঃ** স্থির চিত্তে নাম বা ধ্যান করা হচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ একটা জোর শব্দ হলো, কেহ এসে জোরে ডাক দিলে বা দেহটাতে ধাক্কা দিলে বা কিছুতে কামড়ালে, তখন মনটা একদম নাম ধ্যান থেকে পৃথক হয়ে বহির্ম্মুখী হয়ে পড়ে, তাকে "বিক্ষেপ" বলে। এই বিঘ্ন দূর করার উপায়—নির্জ্জনে ও পরিষ্কার স্থানে বসে নাম ও ধ্যানাদি করা এবং আত্মীয়-স্বজনকে জানিয়ে দেওয়া যে তাঁরা যেন নাম-ধ্যানাদির সময় জোরে না ডাকেন, বা ধাক্কাদি না দেন, বা ডাকার আবশ্যক হলে খুব আস্তে আস্তে গা স্পর্শ করেন।

(২) **কষায় ঃ** পূর্ব্ব জন্মের কার্য্যের ছাপ, এ জন্মে যা কখনও শুনি নাই বা দেখি নাই, নাম, ধ্যান বা ভজনের সময় তরঙ্গরূপে প্রকাশ পায়। তাকে "কষায়" বলে। এই বিঘ্ন দূর করার উপায়—প্রেম পূর্ব্বক সদ্‌গুরু রূপের ধ্যান করা।

(৩) **রসাস্বাদ ঃ** নাম, ধ্যান বা ভজনের সময় সামান্য রস পেয়ে মগ্ন ও তৃপ্ত হয়ে যাওয়া—মন আর অভ্যাসে বসতে চায় না, অলসতা আসে, তাকে "রসাস্বাদ" বলে। এই বিঘ্ন দূর করার উপায়—কিছুক্ষণের জন্য হাত, পা, ছড়িয়ে দিয়ে বসা বা উঠে একটু বেড়াবার পর পুনরায় বসা।

নামে বা ধ্যানে বসে যদি মলত্যাগের বা প্রস্রাবের বেগ আসে, তাহলে সে বেগ রোধ করার চেষ্টা করা ভাল নয়। মল বা প্রস্রাব ত্যাগ করে বসা ভাল।

অতিরিক্ত ভোজনে অলসতা আসে, নাম ধ্যানাদি হয় না। চারি ভাগের এক ভাগ কম খাওয়া ভালো। রাত্রে লঘু আহার দরকার।

কোন প্রকার অশৌচ অবস্থাতেও নাম, ধ্যান করা নিষেধ নাই।

অসুস্থ অবস্থায় বসতে অপারগ হলে শুয়ে শুয়ে নাম করা চলে।

কাম ক্রোধাদির বা দ্বেষ হিংসার ধারা মনে রেখে কোন কাজ করলে বা কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কা'রও মনে কষ্ট দিলে নাম-ধ্যান ভাল হয় না। কারণ এই সমস্ত অপবিত্র ধারা মনকে নিম্নগামী করে রাখে। গীতায় আছে ঃ

> "ত্রিবিধ নরকেস্যেদং নাশিতামাত্মনঃ
> কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎত্রয়ং ত্যজেৎ।"

অর্থাৎ নরকের তিনটি দরজা—কাম, ক্রোধ ও লোভ, সুতরাং এই তিনটি পরিত্যাগ কর।

ময়লার কীটকে ময়লা থেকে বাহির করে যদি পরিষ্কার স্থানে রাখা যায়, তা তার ভাল লাগে না, সে দৌড়ে আবার ময়লার মধ্যেই যেতে চায়। আমাদের মনও সেই রকম। সংসারের চিন্তাতেই ডুবে থাকতে চায়, নাম, ধ্যান করতে চায় না। জোর করে নাম-ধ্যান করাও ভাল। শ্রীশ্রীঠাকুর ভাববাণীতে বলেছেন ঃ

"নাম ঔষধ, কুইনাইন গেলার মত খাওয়াও ভাল।" তিনি আরও বলেছেন ঃ—

> "নাম করে যা নিশ্বাসপ্রশ্বাসের মত। নামহীন দেহ রোগের মন্দির। নামে কামিনীকাঞ্চন সব খুলে পড়ে। নামে ভবরোগ দূর, মুক্তি করতলগত। নামের শক্তি নাম, নাম করতে করতে প্রণবে চড়া যায়।"

"দেখ্ নিঝুম হয়ে নাম কর, ডুবে নাম কর, বেশ তালে তালে নাম কর, আর মনের চোখটা ঠিক জায়গায় রাখ।

ঐ নামটি আর ধ্যানটি যদি ২৪ ঘণ্টা করতে পারিস, এমনকি অন্যের সঙ্গে কথা কইতেও ধ্যানটি হওয়া দরকার।"

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অপর একটি ধ্যানের কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে শবাসনে অর্থাৎ সটান চিৎ হয়ে শুয়ে, হাত-পা ছড়িয়ে, মাথায় বালিশ না দিয়ে, মাথার পেছন দিকে, ঘাড়ের ঠিক উপরে, যাকে মেডুলা অবলঙ্গাটা (medula oblongata) বলে, সেখানে দিনের মধ্যে ২/৩ বার কমপক্ষে ৫/৭ মিনিট করে ধ্যান করা। মূর্ত্তি না এলেও ঐ স্থানটাকে চিন্তা করা। তাতে দেহ সুস্থ থাকে।

ভজন

ভজন অর্থে—শব্দ-যোগ অভ্যাস। নাম ও ধ্যান ভালরূপ অভ্যাস হলে যখন শব্দ (অনাহত নাদ) খুলতে আরম্ভ হয়, তখন অভ্যাসীকে ভজন-প্রণালী বলে দেওয়া হয়। নাম ও ধ্যান ভালরূপ অভ্যাস হওয়ার পূর্বে ভজন অভ্যাসে মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের আশঙ্কাই অধিক। তাই নাম ও ধ্যান যাতে ভাল হয়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সদ্‌গুরুর প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস যার যত বেশী, তার নাম ও ধ্যান তত ভাল হয় এবং শব্দও খুলে।

ভজনের আসনকে "কুক্কুট" আসন বলে। এ আসনও সহজ আসন। এ আসনে বসলে আমাদের দেহে যে চৈতন্যধারা প্রবাহিত হচ্ছে, বসবার কৌশলে সহজে তেসরাতিলে জমাট বাঁধে

(concentrated হয়) এবং ধ্যানের সহায়তা করে।

প্রকৃত অনাহত নাদ (যাকে আদি নাম বা বীজ বলে) নির্ম্মল চৈতন্যদেশের রাধাস্বামীধাম থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং ক্রমান্বয়ে স্তর ভেদ করতে করতে ব্রহ্মাণ্ড দেশে সহস্রদল পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। পিণ্ডদেশে যে-সকল শব্দ শুনা যায় সেগুলি ব্রহ্মাণ্ডদেশের শব্দের প্রতিধ্বনি (resound) মাত্র। কোন নদী, পুষ্করিণী বা ময়দানের এক প্রান্ত থেকে কোন শব্দ করলে যেমন অপর প্রান্ত থেকে তার প্রতিধ্বনি আসে, সেইরূপ্ ব্রহ্মাণ্ডদেশের স্তরে স্তরে যে-সকল শব্দ স্বতঃই ধ্বনিত হচ্ছে, পিণ্ডদেশের শব্দগুলি তাদের প্রতিধ্বনি। প্রকৃত শব্দ পিণ্ডদেশে নাই। এই কারণে শব্দযোগ অভ্যাসে পিণ্ডদেশের চক্রগুলি বাদ দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সহস্রদল থেকে শব্দ অভ্যাস আরম্ভ করানো হয়। এখান থেকে শব্দের পর শব্দ ধরতে ধরতে অভ্যাসী দয়ালদেশে রাধাস্বামীধাম পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। কোন্ শব্দের পর কোন্ শব্দ এবং কোন্ মণ্ডলে কোন্ শব্দের উৎপত্তি এবং প্রতি মণ্ডলের রূপ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম প্রভৃতি ভজন দীক্ষার সময় বিশেষভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, এবং বসবার বিধিও (আসন) দেখিয়ে দেওয়া হয়।

চুম্বকে যেমন আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নামে ২টি শক্তি বা ধারা (Current) বর্ত্তমান, এই সকল অনাহত নাদের বা শব্দের ভিতরও সেইরকম আকর্ষণ (Attraction) এবং বিকর্ষণ (Repulsion) শক্তি আছে। আকর্ষণশক্তি বা ধারা ভিতরে, ঊর্দ্ধদিকে (Inward & upward) এবং বিকর্ষণ শক্তি বাহিরে, নীচের দিকে (outward & downward)।

আমাদের মন ও সুরত এই আকর্ষণীধারায় যুক্ত হলে তাদের

উর্দ্ধগতি (Elevation) হয় এবং ধীরে ধীরে শব্দের পর শব্দ ধরতে ধরতে পরম ধামের দিকে চলতে থাকে। আমাদের দেশে প্রতিমাপূজায় আরতির সময় যে-সকল বাদ্য (শব্দ) ব্যবহৃত হয় যেমন শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি, সেগুলি এই অনাহত নাদের অনুকরণ মাত্র। আমাদের এই দেহরূপ মন্দিরের ভিতর অহরহ সেই পরম পুরুষের আরতি হচ্ছে, আর ভাগ্যবান মহাপুরুষেরা সেই আরতি দর্শন ও শ্রবণ করে মোহিত হচ্ছেন। মূর্খ জীব অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁকে বাহিরে অনুসন্ধান করছে। তাই মহাত্মা কবীর বলেছেন ঃ

"যা কারণ জগ ঢুঁড়িয়া সো তো ঘটহি মাহি।
পরদা দিয়া ভরম্‌কি তাতে সুঝে নাহি॥"

অর্থাৎ যাঁকে জগতে খুঁজে বেড়াচ্ছ তিনি তো দেহের মধ্যেই আছেন। ভ্রমের পরদা দিয়েছ বলে দেখতে পাচ্ছ না।

ভজনের আসনে বসে তেসরাতিলে চিত্তসংযম করে সদ্‌গুরুর প্রেমময় মূর্ত্তিখানি ধ্যান করতে হয়। ধ্যান গাঢ় হলে আস্তে আস্তে শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, সহস্রদল হতে শব্দ আসে। প্রথমে বহু দূরের শব্দের ন্যায় মিশ্রিত শব্দ আসে। ক্রমশঃ ধ্যান গাঢ়তর হলে শব্দ নিকটস্থ ও স্পষ্ট হতে থাকে। শব্দের গতি স্ক্রুপের পাকের মত, উপর (মস্তক) থেকে ঘুরে ঘুরে নামতে থাকে, বিশেষ লক্ষ্য না করলে এই ঘুরে আসাটা ধরা যায় না।

ভজনের বিধি দুই প্রকার ঃ

(১) সহস্রদল থেকে প্রতি মণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার (presiding deity-র) রূপ ও লীলাদি ধ্যান করে যাওয়া।
(২) সদ্‌গুরুমূর্ত্তির ধ্যান করে যাওয়া।

প্রথম প্রকারে প্রতিমণ্ডলে ধ্যান পরিবর্ত্তন করতে হয়। আর সদ্‌গুরুমূর্ত্তির ধ্যানে পরিবর্ত্তন নাই, সুতরাং সদ্‌গুরুমূর্ত্তি ধ্যান করে যাওয়া সহজ উপায়। ধ্যান করতে করতে যখন শব্দ জাগে, তখন সেই শব্দের দিকে লক্ষ্য রেখে শব্দের পর শব্দ ধরে উঠতে হয়।

এই শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত—(১) দয়ালের শব্দ ও (২) কালের শব্দ। দয়ালের শব্দ আকর্ষণী, অন্তর্ম্মুখী; আর কালের শব্দ বিকর্ষণী, বহির্ম্মুখী। দয়ালের শব্দ ডান কানে আর কালের শব্দ বাঁ কানে শুনা যায়। হিন্দী পুস্তক এই দুই শব্দের নির্ণয় নিম্নলিখিত ভাবে করেছেন ঃ—

"জো নিদা খেঁচে হ্যায় উঁচেকো তুঝে।
জান্ ওহ্ ধুন আতি হ্যায় উঁচে সে তুঝে।
সুন্‌কে জো আওয়াজ জাগে কামনা,
কালকী আওয়াজ হ্যায় ঘর ঘাল না॥"

অর্থাৎ, যে শব্দ তোমাকে উপরে টানে সে শব্দ উপর থেকে আসে, আর যে শব্দ শুনে কামনা জাগে উহা কালের শব্দ, অনিষ্টকর। কালের শব্দ বহির্ম্মুখী, মনকে বাহিরে টেনে আনে অর্থাৎ বাহিরের বিষয়ে যুক্ত করে।

দয়ালের শব্দ মাথার ঠিক মাঝখানে একটু ডান দিকে, ডান কানে আর কালের শব্দ বাঁ কানে শুনা যায়। বাঁ কানে শব্দ হলে বাঁ কানের চাপ হাল্‌কা করে দিতে হয় অথবা ছেড়ে দিতে হয় এবং চিত্তকে ডান দিকে একাগ্র করতে হয়, তাহলে ডান কানে শব্দ শুনা যায়। শব্দ (গুম) গুপ্ত হলে সদ্‌গুরুমূর্ত্তি ধ্যান করতে হয়। ধ্যানেতেই শব্দ জাগে, এবং শব্দতে মন যত একাগ্র হয়, ততই মনের ও সুরতের চড়াই হতে থাকে এবং তার ফলে দর্শন ও শ্রবণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়

ও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। শরীর ও মন আনন্দে আপ্লুত থাকে এবং সদ্‌গুরুর প্রতি ভালবাসা দৃঢ় হয়।

মনে মলিনতা থাকলে ভজন করা ভাল নয়, কারণ তাতে মনের উর্দ্ধগতি হওয়া দূরে থাকুক, বিকর্ষণী ধারায় পড়ে। সুতরাং ভজনের আগে ভাল রকম নাম ও ধ্যান করা দরকার। কিন্তু অনেকেই ভজনে শব্দ শুনার ও রূপাদি দেখার প্রলোভনে নাম ও ধ্যান কম করে প্রথমেই ভজন বেশী করতে চাহেন, কাজেই রস ও আনন্দ যেমন পাওয়ার কথা তা পান না। উপরন্তু কাম-ক্রোধাদির তাড়নায় কষ্ট পান।

ভজনের সময় মন চঞ্চল হলে ভজনের আসনে বসেই নাম ও ধ্যান করা কর্ত্তব্য। নাম ও ধ্যানে যদি মন না লাগে তাহলে নামকে চারি ভাগে বিভক্ত করে, পূর্ব্বে যেমন বলা হয়েছে, নাভি থেকে আরম্ভ করে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত, পরে হৃদয় থেকে আরম্ভ করে সহস্রদল পর্য্যন্ত, কণ্ঠ থেকে আরম্ভ করে ত্রিকুটী পর্য্যন্ত, এইভাবে সত্যলোক পর্য্যন্ত মনে মনে অথবা উচ্চারণ করে নাম করতে হয়। এইরূপ নাম ও ধ্যানের পরিচ্ছেদে যে-সমস্ত বিঘ্নের কথা বলা হয়েছে সে-সমস্ত বিঘ্নই ভজনের সময়ও হয়ে থাকে। যেমন তন্দ্রা, লয়, বিক্ষেপ, কষায় ইত্যাদি। তা ছাড়া কতকগুলি পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা থেকেও অভ্যাসে বিঘ্ন উপস্থিত করে। যেমন ঃ—

(১) সংসারে অর্থাভাব বা অন্যান্য কারণে অশান্তিবশতঃ মনের চঞ্চলতা হেতু।

(২) রোগ, শোকবশতঃ দেহ ও মনের অশান্তি হেতু।

(৩) বিষয়ী এবং অসৎ লোকের সঙ্গ এবং অসদালোচনা দ্বারা মনের নিম্নগতি হেতু;

অভ্যাসে মন লাগে না। মনের একাগ্রতা ও উর্দ্ধগতির অভাবে প্রেম জাগে না। কাজেই অভ্যাসে কোন রস বা আনন্দ পাওয়া যায় না। মন শুষ্ক ও নীরস থাকে।

কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়ার মূলে থাকে মনের একাগ্রতা। যেখানে একাগ্রতার অভাব সেখানে কার্য্যও অসম্পূর্ণ থাকে, মন নীরস হয়। আহারের সময় মন যদি অন্য বিষয়ে যুক্ত ও মগ্ন থাকে, তখন যেমন আহার্য্য দ্রব্যের আস্বাদন পাওয়া যায় না, সেইরকম অভ্যাসের সময় মন যদি অন্য বিষয়ে যুক্ত ও মগ্ন থাকে তখন অভ্যাসের কোন রস বা আনন্দ পাওয়া যায় না। সুতরাং অভ্যাসের সময় অন্য চিন্তা পরিত্যাগ করে লক্ষ্যে মন সংযুক্ত করা দরকার। ঠিক ঠিক অভ্যাস হলে মনের একাগ্রতা উর্দ্ধগতির লক্ষণ স্বরূপ অনেক প্রকার দর্শন শ্রবণাদি হয়ে থাকে। এইরূপ দর্শন শ্রবণাদি উন্নতির লক্ষণ বটে, কিন্তু ইহারা অনেক সময় অসতর্কিতভাবে অভ্যাসীর মনে অহংকারের সৃষ্টি করে ও উন্নতির বিঘ্ন ঘটায়। তাই সদাসর্ব্বদা মনের উপর চৌকিদারী করা দরকার। দেখতে হয় যে মন কোন পথে যাচ্ছে। সদ্‌গুরুর প্রত্যক্ষ সেবাদিতেও এইরূপ বিঘ্নের আশঙ্কা আছে।

অভ্যাসে কোন প্রকার (experience) দর্শন শ্রবণাদি হলে যেখানে সেখানে ও যাকে তাকে বলা নিষেধ। একমাত্র সদ্‌গুরুকে বলাই দরকার। অভাবে উচ্চস্তরের অভ্যাসী ও প্রেমী সৎসঙ্গীকে বলতে পারা যায়। অন্যত্র বলায় অনিষ্টের সম্ভাবনা অধিক।

অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় যে অভ্যাসে বসলেই খারাপ তরঙ্গ উঠতে থাকে এবং রোধ করবার চেষ্টা সত্ত্বেও রোধ করা যায় না। তখন অভ্যাস ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা হয়। এমন অবস্থায় অভ্যাস ছেড়ে না দিয়ে জোর করে বেশীক্ষণ তেসরাতিলে লক্ষ্য রেখে নাম,

ধ্যান করা ভাল। ধৈর্য্য ধরে কিছুক্ষণ এইরূপ করলেই ঐ সকল তরঙ্গ দূর হবে।

আবার কখনও কখনও দেখা যায় অভ্যাসে বসলেই হাই ওঠে, গা চুলকায়, গায়ে যেন পোকা হাঁটে, সর্দ্দি কাশী আসে, চোখ দিয়ে জল পড়ে ইত্যাদি। বাস্তবিক এগুলি অভ্যাসের বিঘ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। বাহিরে হঠাৎ একখণ্ড মেঘ এসে যেমন সূর্য্যকে ঢেকে ফেলে এগুলিও ঐরূপ অভ্যাসের সময় বিঘ্নরূপে আসে। দৃঢ়তার সহিত নাম-ধ্যান করলেই ঐ সকল বিঘ্ন দূর হয়।

সংযমের দিকে দৃষ্টি না রাখলেও অভ্যাসে বিঘ্ন হয়, যেমন আহারসংযম, বাক্যসংযম, ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি। বেশী খাওয়া, বেশী কথা কহা, কামক্রোধাদির বশবর্ত্তী হওয়া, দ্বেষ, হিংসা, পরনিন্দা প্রভৃতি অনিষ্টকর।

কোন বস্তুর কি ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত আসক্তি বা দ্বেষ (বিরক্তি), অভ্যাসের অন্তরায়। অভ্যাসের সময় তাদের কথা মনে পড়ে লক্ষ্য থেকে তফাৎ করে।

ভজনের আসনে বসে ভজন করতে অপারগ হলে দুই বগলে বৈরাগণ কাঠ দিয়ে স্বস্তিক আসনে বসে ভজন করা যায়। বৈরাগণ কাঠ পশ্চিমা সাধুরা প্রায়ই ব্যবহার করেন, দেখে থাকবেন। বৈরাগণ কাঠ ঃ— একটা কাঠের দণ্ডের মাথায় অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আর একখানি কাঠ লাগান। তাই দুই বগলে দুটি দিতে হয়, তাহলে মেরুদণ্ড সোজা থাকে। খাটের উপর কনুই রেখে স্বস্তিক আসনে বসে ভজন করা চলে। চিৎ হয়ে শুয়ে বুকের উপর মোটা লম্বা বালিশ বা দুই পাশে ২টা বালিশ রেখে তার উপর কুনুই রেখেও ভজন করা যায়। তবে নির্দ্দিষ্ট কুক্কুট আসনে বসে ভজন করাই প্রশস্ত।

অনেকক্ষণ ভজনের আসনে বসে ভজন করতে করতে পায়ের ডিমে ব্যথা হতে পারে। পায়ে যন্ত্রণা যদি হয়, কট্ কট্ ঝন্ ঝন্ করে তাহলে ভজনের আসন সামান্য পরিবর্ত্তন করে বসতে হয়। উপদেশ দেওয়ার সময় সেটা দেখিয়ে দেওয়া হয়। কুক্কুট আসনে বসে ভজন করবার সময় সেটা দেখিয়ে দেওয়া হয়। কুক্কুট আসনে বসে ভজন করবার সময় পাছার নীচে একটা ছোট বালিশ দিয়ে তার উপর বসা ভাল।

ভজনের সময় যদি দেহের কোন অংশ শক্তিহীন বোধ হয়, তাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। ভজন ভাল হলে, সুরতের চড়াই হয় এবং সুরতের চড়াই হলে ঐ অংশ শক্তিহীন বোধ হয়। ভজন শেষ হলে কিছুক্ষণ পা-চালি করে বেড়ালে এই অবশ ভাব দূর হয়।

ভজনে বিশেষ রস বা আনন্দ পাওয়া হেতু সংসারে হঠাৎ একটা বৈরাগ্য বা বিরক্তিভাব আনা ঠিক নয়। এ অবস্থায় বিষয়-কার্য্য সংসার ত্যাগ করা অনুচিৎ। কারণ এভাব স্থায়ী হয় না। এভাব হজম করা কর্ত্তব্য।

ভজনে কখন শব্দ জাগে, কখন বা গুপ্ত হয়। এইরূপ গুপ্ত হওয়ার কারণ হলো অভ্যাসীর নিয়মিত অভ্যাসের ও সংযমের অভাব। মালিক অভ্যাসীর বিরহ জাগাবার জন্যও কখনও কখনও শব্দ গুপ্ত করেন। যাই হোক, ধৈর্য্য ধরে অভ্যাস করে যাওয়া দরকার। হতাশ হওয়ার কারণ নাই। অসুস্থ হলে ভজনে না বসাই ভাল। নাম ও ধ্যান বেশী করতে হয়।

স্ত্রীলোকের পক্ষে গর্ভাবস্থায় ছয় মাসের পর ভজন করা বিধেয় নয়। প্রসবের পর অন্ততঃ পক্ষে ৩/৪ মাস ভজন নিষিদ্ধ। নাম ও ধ্যান করা বিধি।

ভজন থেকে উঠেই আহার করা ঠিক নয়। অন্ততঃ পক্ষে অর্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করা চাই। এবং আহারের পর ২ ঘণ্টা বাদে ভজনে বসা চলে। আহারের ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের জন্য চৈতন্যধারার গতি স্বভাবতঃ নীচের দিকে আসে। ঐ সময় ভজন করলে অর্থাৎ চৈতন্যধারাকে উর্দ্ধদিকে টানলে বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, তাতে সুফল ফলে না।

অনেককে বলতে শুনা যায় যে তাঁরা শব্দ শুনতে পান। প্রকৃত শব্দ জাগলে চরিত্রের পরিবর্ত্তন আসা স্বাভাবিক। শব্দ শুনি, অথচ চরিত্রের যদি কোনো পরিবর্ত্তন না ঘটে, তাহলে বুঝা উচিৎ যে, যে শব্দ শুনা যাচ্ছে তা প্রকৃত শব্দ নয়। প্রকৃত শব্দ খুললে মনের অবস্থা ও চরিত্রের পরিবর্ত্তন আসবেই। নাম, ধ্যান ও ভজন এ তিনের উদ্দেশ্য কিন্তু একই অর্থাৎ মন ও সুরতের একাগ্রতা ও উর্দ্ধগতি (Concentration & Elevation) করা এবং চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ (Adjustment) করা ও সদ্‌গুরুর প্রতি ভালবাসা জাগান। আর তা না হলেই বুঝতে হবে যে অভ্যাস ঠিক ঠিক হচ্ছে না। সদ্‌গুরুর প্রতি ভালবাসা জন্মালেই সে ভালবাসা আপনা আপনিই বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। স্বপ্রকাশ পদার্থের কিরণ কখনই নিজ কেন্দ্রে আবদ্ধ থাকতে পারে না, সে কিরণ তার চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়েই। এই ভাবে ভক্তের কাছে বিশ্ব আপনার হয়ে পড়ে এবং সদ্‌গুরু ও ভগবান হয়ে ফুটে ওঠেন।

এখানে একটা কথা জেনে রাখা বিশেষ আবশ্যক যে শব্দযোগ (ভজন) ও ধ্যান উভয় ক্ষেত্রেই প্রেমের প্রয়োজন। প্রেম না থাকলে অভ্যাস হয় না, ধ্যানও হয় না। অনেককে এরকম বলতে শুনা যায় যে ভক্তিভাবে চিন্তা দ্বারাই কার্য্য পূর্ণ হতে পারে, অন্য অভ্যাসের আর আবশ্যকতা নাই। একথাটা কিন্তু ঠিক বলে মনে হয় না, কারণ

ভাবপ্রবণতাবশতঃ অনেককে অনেক সময় অনেক কিছু বলতে শুনা যায় ও করতে দেখা যায়, কিন্তু অন্তর অভ্যাস কসুর থাকায় ঐ ভাব বজায় রাখতে পারে না, সামান্য সামান্য কারণেই ভাবের অভাব হয়, অবিশ্বাস এসে পথভ্রষ্ট করে। তাই বলি যে ভজন ও নাম-ধ্যানাদি প্রেমপূর্ব্বক করে যাওয়া দরকার, কোনটাই বাদ দিতে নাই! অন্তর অভ্যাস দ্বারাই চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং জ্ঞান জন্মায়, তখন কোন বিরুদ্ধ ভাবই মনকে টলাতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর যে বৌ-সর্ব্বস্বের কথা বলেন আমার মনে হয় সেই বৌ-সর্ব্বস্বের ধ্যানের সঙ্গে বৃত্তিভেদী টানের উপমা দেওয়া চলে। বৌ-সর্ব্বস্ব যেমন সদাসর্ব্বদা বৌ নিয়েই ব্যস্ত, অপর সব কিছুই তার কাছে তুচ্ছ, সেইরকম যাদের বৃত্তিভেদী টান হয় তারাও ইষ্ট-সর্ব্বস্ব হয়ে উঠে, তাঁকে নিয়েই সে ব্যস্ত, অপর সব পিছনে পড়ে। তখন ইষ্টকে এমনভাবে পেতে চায় যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি আছে ঃ—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
সর্ব্ব অঙ্গ লাগি কাঁদে, সর্ব্ব অঙ্গ মোর।।"

নাম, ধ্যান ও ভজন সম্বন্ধে পুস্তকে যতদূর লেখা সম্ভব তাই লেখা হলো। ইহা ব্যতীত অন্য কোন বিষয় জানবার আবশ্যক হলে সদ্‌গুরুর দরবারে নিজে এসে জেনে লওয়াই কর্ত্তব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সদ্‌গুরুর প্রতি সৎসঙ্গীদের ব্যবহার

বস্তুবোধ না থাকলে যেমন বস্তুর উপযুক্ত কদর হয় না, সেই রকম গুরুজ্ঞান না থাকলে গুরুরও উপযুক্ত কদর হয় না। তাই হিন্দী পুস্তকে আছে ঃ—

"বিন্ সদ্‌গুরু ভক্তি বৃথা জনম্ নরনারী।
গুরুজ্ঞান বিনা সংসার আঁধেরা ভারি।।"

অর্থাৎ সদ্‌গুরু-ভক্তি-ভিন্ন নরনারীর জন্মই বৃথা, গুরুজ্ঞান অভাবে সংসার অন্ধকারাচ্ছন্ন।

'সত্যানুসরণে' আছে ঃ—"গুরুই ভগবানের সাকার মূর্ত্তি।" অর্থাৎ গুরুই ভগবান। বোধ বা জ্ঞানের পরিমাণ হিসাবে ব্যবহারের তারতম্য আসে। যে বস্তুর তত্ত্বতঃ বোধ যতখানি সে বস্তুর প্রতি ততখানি ভালবাসা হয় ও তদনুরূপ ব্যবহার আসে। সুতরাং যতদিন গুরুতে ভগবান বোধ না জন্মায় ততদিন ঠিক ঠিক তাঁর প্রতি ভগবদ্ভাবের ব্যবহার আসে না। এই "ভগবান বোধ" আসা আর বুদ্ধি করে "ভগবান ভাবা" এ দুটো পৃথক জিনিষ। বুদ্ধি করে (intellectual conviction নিয়ে) চলতে চলতে সদ্‌গুরুর কৃপায়, তাঁর সঙ্গগুণে

ও তাঁর উপদিষ্ট অভ্যাস দ্বারা যে পরিমাণে বোধ আসতে থাকে, সেই পরিমাণে তদুপযুক্ত ব্যবহারও আসে। প্রথমে সদ্‌গুরুতে ভগবান বোধ আসে না, অথচ সদ্‌গুরুর প্রতি ভালবাসা না হলেও পরমার্থে অগ্রসর হওয়াও সুকঠিন, তাই মহাত্মা কবীর বলেছেন ঃ—

"পহিলে দাতা শিষ্‌ভয়া, জিন তন্ মন্ অরপা শিশ্
পিছে দাতা গুরুভয়ে, জিন নাম কিয়া বক্‌শিশ্"।

অর্থাৎ, প্রথমেই শিষ্যকেই দাতা হয়ে তনু, মন ও মস্তক অর্পণ করতে হবে, পশ্চাতে গুরু দাতা হয়ে নাম দিবেন। তাহলে প্রথমে শিষ্যকেই গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করতে হবে, তারপর গুরু কৃপা করবেন—এই বুঝা গেল।

"গুরুই ভগবান" এ বোধ না আসা পর্য্যন্ত তো পূর্ণ আত্মসমর্পণ আসে না, তাই প্রথমে গুরুকে আত্মীয়, বন্ধু বা উপদেষ্টা বোধে ভালবাসতে হয়। তারপরে তাঁর মহিমার জ্ঞান যেমন যেমন জন্মাতে থাকে, সেই পরিমাণে ভালবাসা বাড়তে থাকে, ব্যবহারও তদনুযায়ী হয়। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমে আত্মীয়, পরে সখা, তৎপরে গুরু এবং অবশেষে ভগবান বলে বোধ করেছিলেন। প্রথমেই ভগবান বলে বোধ করতে পারেননি। অবশেষে ভগবান বোধ হওয়ায় তাঁর প্রথম অজ্ঞানতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের পর শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন ঃ—

"তোমার এই মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ না জানায় আমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত বা প্রণয়বশতঃ বয়স্য মনে করে অবিবেচনা পূর্ব্বক তাচ্ছিল্য ভাবে যা বলেছি, এবং বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন কালে যে অবজ্ঞা করেছি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

আমরাও সদ্‌গুরুকে আমাদের মত একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করি। মুখে তাঁকে যত বড়ই বলি না কেন, তাঁর সম্বন্ধে প্রকৃত বোধ না আসা হেতু, কাজে ও ব্যবহারে ঠিক হতে পারি না। মুখে বলি এক, কাজে করি আর এক, এইরকম হয়ে পড়ে।

এই পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে শ্রীশ্রীঠাকুর সুস্পষ্টভাবে আমাদিগকে বলে দিয়েছেন যে বৃত্তিভেদী টান ইষ্টের প্রতি হলেই ভগবান দেখা যায়। এখন বৃত্তিভেদী টান যাতে জন্মায় তাই আমাদের করতে হবে।

সদ্‌গুরুকে জানতে হলে তাঁর প্রতি কোন একটা ভাব স্থাপন করে ভালবাসতে হয়। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ভগবানের উপাসনা সম্বন্ধে পাঁচ প্রকার ভাবের উল্লেখ আছে। যথা ঃ—সান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এবং সান্ত থেকে মধুর পর্য্যন্ত পরপর ভাবের শ্রেষ্ঠত্ব দেখান হয়েছে। সান্তভাব সাধারণ প্রবৃত্ত ভাব। দাস্যভাব ছিল হনুমানের, শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতির সখ্যভাব, নন্দ ও যশোদার বাৎসল্যভাব, এবং শ্রীরাধিকার মধুর ভাব ছিল। যিনি যে ভাবে সাধক তাঁর নিকট সেই ভাবই উত্তম। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, "নদীর কূলের মাটি সব কাদা"। সমস্ত ভাবের চরম অবস্থাকে মধুর বলা যায়।

বাস্তবিকই ভালবাসার মধ্যে একটা সম্বন্ধ বা ভাব যেন আপনা আপনি এসে পড়ে, আর সেই সম্বন্ধ অনুরূপ আচার ব্যবহারও আসে। সংসারে পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি যাহাদিগের সহিত আমাদের মাত্র ইহকালের সম্বন্ধ, তাঁদের প্রতি আমাদের কত ভালবাসা, আর সদ্‌গুরু যিনি ইহকালের ও পরকালের মঙ্গলকারী, সুহৃদ্ ও সহায় তাঁর প্রতি আমাদের কত বেশী ভালবাসা হওয়া উচিৎ? গুরুই আমাদের উপাস্য। ভাববাণীতে আছে ঃ—

> "নারে, না, না, গুরু একজন, সেই অনামী
> পুরুষ, আর বিরাটত্ব প্রেম যার ভিতর
> জেগে উঠেছে সেই সদ্‌গুরু। আমরা
> সাকার কি না?—তাই সদ্‌গুরু আমাদের
> উপাস্য। একমাত্র সদ্‌গুরুই সেই ধামে
> নিয়ে যেতে পারে।"

প্রতিমা বা নারায়ণ শিলা প্রভৃতি উপাস্য বোধে আমরা তাঁদের প্রতি কত শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয় ও সম্মান দেখাই ও পবিত্রতা রক্ষা করে চলি; আর যিনি সাক্ষাৎ জীবন্ত ঈশ্বর সদ্‌গুরু, তাঁর প্রতি ততখানি শ্রদ্ধা ভক্তি, ভয়, সম্মান প্রভৃতি দেখাতে ও পবিত্রতা রক্ষা করতেও আমরা অক্ষম। যাঁকে ভালবাসা যায়, তাঁকে সুখে সাচ্ছন্দে রাখবার বা তাঁর তৃপ্তি সাধনের একটা চেষ্টা আসা স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের মধ্যে সদ্‌গুরু সম্বন্ধে সে বিষয়ে অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। তার কারণ হলো গুরুর প্রতি ভালবাসার খাঁকতি ও বস্তুবোধের অভাব।

ভালবাসা তো দূরের কথা, স্বার্থবুদ্ধিবশতঃ বা অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা সদ্‌গুরুকে যে কত অসুবিধার মধ্যে ফেলি ও কষ্ট দেই তার ২/৪টা দৃষ্টান্ত নিম্নে দিতেছি ঃ—

(১) সদ্‌গুরুকে যখন তখন যে-কোন অবস্থায় স্পর্শ করা উচিৎ নয়। শুচি হয়ে মনে পবিত্র ভাব নিয়ে স্পর্শ করা উচিৎ। তিনি যদি নিজে কোন অবস্থায় কাহাকেও স্পর্শ করেন তাতে ক্ষতি হয় না। 'অমিয়বাণী'তে আছে ঃ—

> "...আর দেখুন সমস্ত লোক তাদের কুকর্ম্মজ
> সংস্কাররাশি বা পাপাদি নিয়ে অনবরত এ শরীরটার
> contact-এ (সংশ্রবে) আসতে থাকলে এ শরীরটা

বেশী দিন থাকবে না। হাজার হলেও শরীর ধারণ করলেই কতকটা শরীরের উপর ওসবের ক্রিয়া হয়ই। শরীরটা চিরকালের মত অবিনাশী elements-এ (পদার্থে) প্রস্তুত নয় তো? সৎ অসতের মিশ্রণ না হলে, সাজ না দিলে গড়ন হয় না, কাজেই তার উপর অসতের action (ক্রিয়া) হয়। পাহাড়ের উপর ভীষণ বেগে আঘাত করতে করতে পাহাড়ও কাঁপে। আমার will (ইচ্ছা) মত যদি আমি লক্ষ লক্ষ বেশ্যা মায়েদের মধ্যে যেয়ে থাকি বা টাকার মধ্যে, মদ মাতালের মধ্যে যাই তাতে কিছু আসে যায় না, consequenly (সুতরাং) শরীরে ঘা লাগে না কিন্তু যদি লোকে যখন তখন তাদের ইচ্ছা মত সব পাপাদির contact-এ (সংশ্রবে) আনতে থাকে তবে মুস্কিল। পাপসংস্পর্শরূপে ঝড় যদি কতকটা ডালপালার উপর দিয়া যায়, তা হলে গুঁড়িটা বেশী ঘা পায় না, ফলে গাছটা বাঁচে অনেক দিন। আর যদি ঝড়ের বেগ সইবার মত ডালপালা না থাকে গুঁড়িতেই ঘা পড়ে তা হলে আর কত দিন?''

আমরা কিন্তু অতখানি হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করি না। সময় অসময় চিন্তা না করেই আমরা যখন তখন তাঁর কাছে যাই, পা স্পর্শ করে প্রণাম করি, পা স্পর্শ না করলে হয়তো মনের তৃপ্তিই হয় না। এ ভাবটা কিন্তু নিজের মঙ্গল কামনাপ্রসূত। আমার মন তখন পবিত্র কি অপবিত্র ভাবে ভাবিত তা চিন্তাও করি না। অপবিত্র হলে সেই অপবিত্র ভাব সদ্‌গুরুকে ঘা দেয়। তা ছাড়া আমরা তাঁকে কত সময় কত অনাবশ্যক খুঁটিনাটি কথা নিয়ে বিরক্ত করি, এমনকি, তাঁর

বিশ্রামের সময় পর্য্যন্তও নষ্ট করি। আমরা এখানে বহু সৎসঙ্গী বাস করি, ভেবে দেখুন, প্রত্যেকেই যদি এইভাবে তাঁকে সব বলতে চাই, তাহলে প্রত্যেকের কথা শুনতে ও জবাব দিতে তাঁর কত সময় লাগে ও কত কষ্ট হয়। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় (যা তিনি ছাড়া মীমাংসা হবে না) তাঁর কাছে তো বলতে হবেই। এ বিষয়ে প্রত্যেকেরই চিন্তা করা দরকার।

(২) সদ্‌গুরুর ভোগের সময় আমরা অনেকেই সেখানে উপস্থিত হই। ভোগের সময় বেশী ভীড় করা ভাল নয়। অবশ্য যাঁদের আবশ্যক (ভোগের কার্য্যের জন্য) তাঁরা তো থাকবেনই, তা ছাড়া অন্যান্য লোকের থাকার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। আমরা রিপুর বশবর্ত্তী, সব রিপুই আছে, লোভ আছে, কি জানি, ভোগের কোন পদার্থে যদি লোভ আসে তাহলে সে দ্রব্য আহারে সদ্‌গুরুর শরীর অসুস্থ হয়। সুতরাং দূরে থাকা ভাল। ভোগের পর প্রসাদ গ্রহণ করলেই চলতে পারে। আমাদের দেশে দেবদেবীর ভোগের সময়ও অন্ততঃ একটা পরদা আড়াল করে দেওয়া হয় যাতে সাধারণের দৃষ্টি তাতে না পড়ে।

সদ্‌গুরুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন জিনিষ তাঁকে খাওয়ানোর জন্য জিদ্ করা কর্ত্তব্য নয়। মনে করুন সদ্‌গুরুর ভোগের জন্য কতকটা মিষ্টান্ন নিয়ে তাঁর সম্মুখে আমি উপস্থিত, তাঁর তখন খাওয়ার ইচ্ছা না থাকায় বললেন, "এখন থাক পরে খাব"। আমার ইচ্ছা তখনই তিনি একটু খান। অনুরোধ করলাম, ''একটু খেলে ভাল হয়, গরম আছে,'' ইত্যাদি। পাছে আমি মনে কষ্ট পাই, সেই জন্য তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু খেলেন। এইরূপ জিদ্ করে খাওয়ালে দেখা যায় প্রায়ই তাঁর অসুখ হয়। সুতরাং এরূপ না করাই ভাল।

(৩) অনেকস্থলে সদ্‌গুরুর প্রত্যক্ষ দৈহিক সেবা নিয়েও দ্বেষ হিংসার ভাব দেখা যায়। সেরূপ ভাব পোষণ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নয়। সদ্‌গুরু দয়া করে যদি কাহাকেও সেবার কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাতে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করা ও সদা সর্ব্বদা মনে একটা দীন ভাব রাখা উচিৎ। কখনও যেন অহংকার না জাগে। সদ্‌গুরুর তৃপ্তিসাধনই তো উদ্দেশ্য? পরস্পরের মধ্যে সেবা নিয়ে কাড়াকাড়ি রেষারেষী করা ভাল নয়।

(৪) ফাল্গুন মাস, দোল উৎসব, গুরুর পাদপদ্মে আবীর দিতে হবে, লোকের ভীড় খুব বেশী, নিকটে পৌঁছানো মুস্কিল। অগত্যা দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আবীর দেওয়া হচ্ছে। কতক তাঁর চোখে, কতক নাকে মুখে প্রবেশ করলো, কত কষ্ট পেলেন। আমাদের আবীর দেওয়া দরকার, দিচ্ছি, কিন্তু সদ্‌গুরু কষ্ট পাচ্ছেন সেদিকে লক্ষ্য নাই। তারপর দোল উৎসবের স্নান, সদ্‌গুরু স্নান করে ভিজা কাপড়ে আসছেন, প্রণামের ধুম পড়ে গেল। ফাল্গুন মাস, তখন বেশ শীত আছে, ভিজে কাপড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে কাঁপছেন, ভিজে কাপড়খানাও ছাড়িয়ে লওয়ার অবসর হলো না, প্রণামের পর প্রণাম চলছে, সদ্‌গুরুর কষ্টের দিকে, অসুবিধার দিকে, লক্ষ্য নাই। প্রণাম করা না হলে মনে তৃপ্তি হবে না, তাই প্রণাম নিয়েই ব্যস্ত—এই রকম।

(৫) শীতকালে প্রাতে সদ্‌গুরু দর্শনে গেলাম, গিয়ে দেখি তিনি গায়ে লেপ চাপা দিয়ে শুয়ে কথা কচ্ছেন। দূর থেকে প্রণাম করলাম বটে, কিন্তু চরণ স্পর্শ করা হলো না, মন তৃপ্ত হলো না, লেপ উঠিয়ে চরণ স্পর্শ করতে গেলাম, সদ্‌গুরু বললেন, "থাক দাদা থাক"; শুনলাম না, লেপের ভিতর হাত দিয়ে চরণ স্পর্শ করলাম, তাঁর

অনিচ্ছাসত্ত্বেও। গুরুর অসুবিধা বা অনিচ্ছার দিকে লক্ষ্যও করলাম না। এই প্রকারে আমরা কত রকমে তাঁকে অসুবিধার মধ্যে ফেলে কষ্ট দিই, তার ইয়ত্তা নাই, আর এগুলি স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত, তার কোন ভুল নাই।

পাবনা সৎসঙ্গে থাকাকালীন আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উপরোক্ত বিষয়গুলি সৎসঙ্গী দাদাদের ও মায়েদের অবগতির জন্য লিখলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করা সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে একটা ছড়া দিয়েছেন। ছড়াটা এই ঃ—

"শরীরটা তোর লম্বা যত, ততখানি বাদ।
করলে প্রণাম পাবি প্রাণে আনন্দ প্রসাদ।।"

সুতরাং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তফাৎ থেকে প্রণাম করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর হয়তো প্রস্রাব করবার জন্য, কি পায়খানায় যাবেন বলে উঠেছেন, কি চলতে আরম্ভ করেছেন, সেই সময় তাঁকে দাঁড় করিয়ে প্রণাম করা ভাল নয়। তিনি ফিরে এসে সুস্থ হ'য়ে বসলে—তখন প্রণাম করা বিধি।

ঠাকুর ভোগের জন্য কেহ কোন খাদ্যদ্রব্য হাতে করে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করা ঠিক নয়। খাদ্যদ্রবটি কোন পবিত্র স্থানে রেখে, অথবা অপর কাহারও হাতে দিয়ে, তবে প্রণাম করা উচিৎ।

কেহ যদি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণামী বা অর্ঘ্য হিসাবে কিছু দিতে ইচ্ছা করেন উহা শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানার উপর না দিয়ে, পাদুকার (জুতা বা খড়ম যাই থাকুক) উপর দেওয়া ভাল।

আমরা অন্ধ জীব সদ্‌গুরুর মহিমা কিছুই বুঝি না, স্বার্থবুদ্ধিবশতঃ কত সময় সদ্‌গুরুর কার্য্যের উপরও দোষারোপ করে থাকি। তিনি

মঙ্গলময়, জীবের মঙ্গল কিসে হয়, তা তিনিই জানেন। তিনি জীবের কল্যাণের জন্যই নরদেহ ধারণ করে জগতে এসেছেন এবং পতিত, মলিন জীবকে কোলে তুলে লওয়ার জন্য সদা সর্ব্বদা ব্যস্ত। কিন্তু আমরা নরকের কীটের ন্যায় নরকেই থাকতে চাই, তাঁর দিকে পেছন ফিরে নরকের দিকে ছুটি।

আমরা নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করি, কষ্ট পাই আর দোষ চাপিয়ে দিই গুরুর মাথায়। মঙ্গল চাই, কিন্তু যাতে মঙ্গল হয় অর্থাৎ তিনি যে ভাবে চলতে বলেন—তা চলি না।

জীবের মঙ্গলের জন্য সদ্‌গুরু সদাই ব্যস্ত। শ্রীশ্রীঠাকুর 'অমিয়বাণী' পুস্তকে একস্থানে বলেছেন ঃ—

"...দেখুন যাকে ভালবাসা যায় তার কথা শত কার্য্যের মধ্যেও মনে পড়ে। যাই করতে থাকুন, কাম কাঞ্চনের মধ্যে থাকুন আর যাই থাকুন, তাঁর কথা মনে রাখবেন। তিনি যেন এইটুকু দেখতে পান যে সকল অবস্থাতেই তাঁকে মনে একটু স্থান দিয়েছেন। তাঁকে একটু মাত্র ভালবাসেন, আর সব আমি করে দেব।"

হিন্দী পুস্তকেও আছে ঃ—

"তোম্‌হারি চিন্তা মৈ মন ধারি।
তুম্ অচিন্ত রহো, ধরো পিয়ারা।।"

অর্থাৎ, তোমার চিন্তা আমার মনে লেগেই আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কেবল একটু ভালবাস।

এ ভালবাসাটা দিতে পারলেই তাঁর অপার করুণা আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং তিনি যে আমার আপনার হতেও আপনার তা বুঝতে পারি! সদ্‌গুরু ভক্তিই সমস্ত কার্য্যের মূল। যে কোন উপায়ে সদ্‌গুরুর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি হয়—তাই করণীয়।

যেমন হিন্দী পুস্তকে আছে ঃ—

"গুরু ভক্তি দৃঢ়কে করো পিছে আউর উপায়
বিন্ গুরু ভক্তি মোহ জগ্ কভী ন কাটা যায়।।
মোটে বন্ধন জগৎ কে, গুরু ভক্তিসে কাট্।
ঝিনা বন্ধন চিত্তকে, কাটে নাম পরতাপ।।
মোটে জব্‌লগ্ যায় নহী, ঝিনা কৈসে যায়।
তাতে সব্‌কো চাহিয়ে নিত্ গুরুভক্তি কমায়।।"

অর্থাৎ, দৃঢ়ভাবে গুরুভক্তি কর, অন্য উপায় পশ্চাতে, কারণ গুরুভক্তি ভিন্ন জগতের মোহ কাটে না। জগতের মোটা বন্ধন গুরুভক্তির দ্বারা ছেদন কর, আর চিত্তের সূক্ষ্ম বন্ধন নামের প্রতাপে কাট। মোটা বন্ধন না গেলে, সূক্ষ্ম বন্ধন কি প্রকারে যাবে? সুতরাং সকলেরই গুরুভক্তি উপার্জ্জন করাই কর্ত্তব্য।

সৎসঙ্গী ও সর্ব্বসাধারণের প্রতি ব্যবহার

গুরুর প্রতি সৎসঙ্গীদিগের ব্যবহার বিষয়ে দৃষ্টি রাখা যেমন দরকার, অন্যান্য সৎসঙ্গী, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের প্রতিও (সৎসঙ্গী হোক আর না হোক) ব্যবহার বিষয়ে দৃষ্টি রাখা তেমনই দরকার। জ্যেষ্ঠকে শ্রদ্ধা ও সম্মান, কনিষ্ঠকে আদর ও স্নেহ এবং সমবয়স্কদের সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করা উচিৎ। ভাষা কোমল হওয়া দরকার। কাহারও প্রতি এমন ব্যবহার করা অনুচিৎ যাতে মনে ব্যাথা লাগে। ভাববাণীতে আছে ঃ—

"মন সরল, মধুর বচন, আর বুক ভরা প্রেম—
তিনটাই মুক্তির প্রধান উপায়।"

নিজে অপরের নিকট থেকে যেমন ব্যবহার পেতে ইচ্ছা কর অপরের প্রতিও সেই প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। হিন্দী পুস্তকে আছে ঃ—

"কায়েন, মনসা বাচা সবকো সুখ পহুঁচায়।
সুখ ন তু দে সকে তো দুঃখ কাহু মত্ দে।
এঁইসা রহনী জো রহে, সোই শব্দ রস লে।।"

অর্থাৎ কায়, মন ও বাক্য দ্বারা সকলকে সুখী করবে, যদি সুখ দিতে নাও পার, দুঃখ দিও না, এইভাবে যারা চলে, তারাই শব্দরস আস্বাদন করে।

সামাজিক ক্রিয়াকলাপ

সৎসঙ্গীদের ইষ্ট হলো সদ্গুরু। গুরু ভিন্ন অন্য ঈশ্বর কল্পনার সামগ্রী। গুরুই প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বর। সুতরাং প্রত্যক্ষকে বাদ দিয়ে (অপ্রত্যক্ষ) কাল্পনিক মূর্ত্তির পশ্চাতে দৌড়ানো সৎসঙ্গীদিগের আবশ্যকতা নাই। তবে যদি তাঁদের কোন আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব (যাঁরা সৎসঙ্গী নন) মূর্ত্তি পূজা করেন, তাতে বাধা দেওয়া বা তাঁদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা বা কলহ করা কর্ত্তব্য নয়, বরং সেই কাজ যাতে সুসম্পন্ন হয় তাঁহাদিগকে সেইরূপ সাহায্য করা ভাল। পরে সুযোগ বুঝে মূর্ত্তিপূজায় ও সদ্গুরু পূজায় কি পার্থক্য এবং বলিদানাদি জীব হিংসা কত অনিষ্টকর, বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। হিন্দী গদ্য-সার বচনে আছে ঃ—

"অন্যান্য স্তরের দেবতাদিগের প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করা ঠিক নয়, বরং সত্যপুরুষ রাধাস্বামীকে

ইষ্ট ধারণ করলে পথে যে যে পদ বা স্তর আছে তার ধারণা করতে হবে, তা না করলে আদি পদে পৌঁছান যাবে না। পরন্তু এই রাধাস্বামী মতের পন্থা অবলম্বনে চলতে হলে প্রথমে আদি-পদের ধারণা হওয়া আবশ্যক এবং প্রত্যেক স্থানের বিস্তারিত বিবরণ ও অবস্থা বুঝে লওয়া উচিৎ।"

উপরোক্ত পুস্তকে আর এক স্থানে আছে ঃ—

"শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে অর্জ্জুন দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ও সেবাতে থাকলেও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পরম পদে নিয়ে যেতে পারেন নাই বরং বলেছিলেন—যে প্রথমে যোগ অভ্যাস কর পরে পরম পদের অধিকারী হবে। ভেবে দেখ যখন জীবন্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও সঙ্গ করে যোগ অভ্যাস ব্যতিরেকে অর্জ্জুন পরম পদে যাওয়ার উপযুক্ত হতে পারেন নাই, তখন যাহারা শ্রীকৃষ্ণের ধাতু ও প্রস্তরের নকল মূর্ত্তি তৈয়ারী করে সেবা ও পূজায় নিজের সময় অতিবাহিত করে সদ্গুরু ভক্তি ও সহজ যোগ অভ্যাস হতে বিরত থাকে, তাহারা কি প্রকারে পরম পদ প্রাপ্ত হবে?"

এ কথা বলবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে জীবন্ত সদ্গুরুর সাহায্য ও কৃপা ব্যতিরেকে পরম পদ পাওয়া অসম্ভব। সুতরাং সদ্গুরু পূজাই

শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত পথ। দেবদেবীগণ মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাঁদের চরণে মস্তক অবনত করতে ক্ষতি নাই, কিন্তু হৃদয়ের অনুরাগ যেন নিজের ইষ্টের—হৃদয়বাসী গুরুর প্রতিই থাকে। যেমন মহাত্মা কবীর বলেছেন ঃ—

"কবীর দুনিয়া দেহরে শিশ্ নওয়ায়ন যায়
হৃদয় মাহী গুরু বসে তাহে সু লৌ লায়॥"

অর্থাৎ দুনিয়ার দেহের নিকট মস্তক অবনত করতে পারা যায়, কিন্তু হৃদয়বাসী গুরুতে যেন প্রাণের টান থাকে।

আমরা সমাজেই আছি। সমাজকে বাদ দিয়ে আমাদের থাকা চলে না। যাদের মধ্যে থাকতে হবে তাদের মতন হয়ে না থাকলে, তাদের সঙ্গে থাকা পোষায় না। আবার যাহাদিগকে আপনার করে টেনে নিতে হবে তাহাদিগকে দূরে রাখলেও টানা হয় না, তারপর কাহারও দোষ দেখিয়ে আপনার করা যায় না, কাজেই তাদের মধ্যে ঢুকে তাদের মত (সবটা না হো'ক) কতকটা হয়ে, "তোমরা বেশ ভাল" বলে বলে, মিশামিশি করতে হবে। তারপর সুযোগ মত কোথায় ত্রুটি বা পার্থক্য, ভালবাসার মধ্য দিয়ে তাদের দেখাতে বা বুঝাতে হবে। নচেৎ তোমারটা কিছু নয়, তোমারটা ছোট, আমারটা বড় ইত্যাদি বললে তারা দূরে চলে যাবে। বৈদিক ক্রিয়াদি যেমন বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন ও শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রমত করাই ভাল, তা বাদ দেওয়া উচিৎ নয়। যে-কোন কাজই করা যায়, লক্ষ্য ঠিক রেখে করতে পারলে ক্ষতি হয় না।

সব্‌সে বসিয়ে, সব্‌সে রসিয়ে, সবকো লিজিয়ে নাম।
হাঁ-জি হাঁ-জি করতে রহো, বৈঠো আপনা ঠাম॥

ধর্ম্ম জিনিষটা একটা। যেখানে দুই নাই, সেখানে "ছোট", "বড়" তুলনা (comparison) হতে পারে না। তুলনা করা হয় একেরই

বিভিন্ন অবস্থার (position-এর) সঙ্গে। যেমন আমি একটা মানুষ, আমার কয়েকটি অবস্থা আছে ঃ—

বালকত্ব, যুবকত্ব, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য। এ সব অবস্থাগুলি আমারই এবং সবটার মধ্যে আমি আছিই। কিন্তু তাই বলে আমার বালকত্বের সঙ্গে বৃদ্ধত্বের তুলনা হয় না। অনেক বিষয়ে প্রভেদ দেখতে পাওয়া যায়। সেইরকম ধর্ম্ম একটাই, কিন্তু তার জ্ঞানের গভীরতার (Degree-র) তারতম্য আছে এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। এই গভীরতার তারতম্যটাকে ভাষায় ব্যক্ত করতে হলে "ছোট", "বড়", "কম", "বেশী", "অল্প", "অনেক" প্রভৃতি কথার দ্বারা ব্যক্ত করা ছাড়া উপায় কি?

জিনিষটাকে ঠিক ঠিক এইভাবে বুঝে রাখলে কোন সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ার কারণ থাকতে পারে না, বা কোন মতের প্রতি বিদ্বেষ ভাব জাগে না। বিদ্বেষ ভাব না এলেই ভালবেসে মিশামিশি করবার সুযোগও ঘটে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন ঃ— "কিছু পাবার আশা না রেখে পারিপার্শ্বিককে সেবা, সহানুভূতি এ ভালবাসার দ্বারা তুষ্ট ও পুষ্ট করতে হবে, তা হলেই দেখবে যে তুমি তাদেরই স্বার্থ হয়ে উঠেছ।"

"প্রকৃত হলেই প্রকৃতি তার সেবা করে।"

"কিছুই চাইতে হবে না, দেখবে তোমার অভাব আপন আপনিই পূরণ হয়ে যাচ্ছে।"

পরিশিষ্ট

আমরা যে-কোন কাজ করি, তা সংসারের জন্যই হউক আর পরমার্থের জন্যই হউক, করার মত করা না হলে কোনটাই সুসম্পন্ন হয় না এবং সে সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান বা আনন্দ লাভ করা যায় না।

কোন কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে এবং তৎসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান বা আনন্দ লাভ করতে হলে নিরবচ্ছিন্ন যত্ন ও অভ্যাসে সেই কর্ম্ম বা অভ্যাসটাকে চরিত্রগত করে তুলতে হয়। আর সেইরকম করাটার নাম হলো "সাধনা"।

সাধনা বলতে সাধারণতঃ ভগবদারাধনাকেই বুঝায়, কিন্তু ভগবদারাধনা কেন, সকল কাজই সাধনা করে; অভ্যাস করে, শিখতে ও চরিত্রগত করতে হয়।

আমরা জন্মজন্মান্তরীণ অভ্যাস দ্বারা আমাদের এই সংসার করাটাকে অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ, রসাদি বিষয় ভোগ করা ও কামক্রোধাদি রিপুগণের অনুগমন করাটাকে চরিত্রগত করে ফেলেছি। তার ফলে সেই জন্মজন্মান্তরীণ সংস্কার রাশি নিয়ে পুনঃ পুনঃ চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করছি এবং সুখের ও দুঃখের ঘূর্ণিপাকে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছি।

এখন সেই ভাবটাকে বা চরিত্রটাকে বদলে সৎ-এর দিকে, ভগবানের দিকে নিয়ে যেতে পারলে আমরা সেই চিরন্তন দুঃখের

হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি। কিন্তু সেই চিরন্তন অভ্যস্ত চরিত্রটাকে বদলে সৎ-এর দিকে নিয়ে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে বড়ই কঠিন বলে মনে হচ্ছে।

মানুষের মন সংস্কার অনুযায়ী কর্ম্ম করায়, আর কর্ম্মই হলো বন্ধন ও মুক্তির কারণ। সুতরাং মনটাকে সংস্কাররাশি থেকে মুক্ত করতে হলে অভ্যাস বা সাধনার প্রয়োজন। যতদিন এইরূপ অভ্যাস বা সাধনার দ্বারা মনকে সংস্কাররাশি থেকে মুক্ত না করা যায়, ততদিন পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ অনিবার্য্য এবং তজ্জনিত সুখ ও দুঃখ সঙ্গের সাথী হয়ে থাকে। তাই এই দুর্লভ মানব জন্ম পেয়ে মানুষের কর্ত্তব্য হচ্ছে এই চিরন্তন দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া, আর তা পেতে হলেই কেমন করে করলে তা পাওয়া যায় তাই করা।

জন্মজন্মান্তরীণ দুঃখ-কষ্টের কথা মনে না থাকলেও, মানুষ এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে, জন্ম থেকে মরণ পর্য্যন্ত ইহজীবনে যে কত অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে, অর্থাৎ রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতির এবং দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধাদি রিপুগণের তাড়নায় দেহ ও মনের অশান্তি ভোগ করছে, তার তো ইয়ত্তা নেই। এ সব তো সে চায় না; সে চায় সুখ, শান্তি, আনন্দ, আর জীবন, যশ ও বৃদ্ধি। তা তো পায়ই না, হা হুতাশের মধ্য দিয়েই তাকে ইহকালের লীলা শেষ করতে হয়। পরকালের কথা তো পরে।

উপরোক্ত শান্তি, আনন্দ প্রভৃতি বিষয়গুলি পেতে হলেই একমাত্র মহাজনদিগের আদিষ্ট পন্থাই পন্থা। আজ পর্য্যন্ত যত মহাপুরুষ বা অবতার পুরুষেরা জগতে জীবের কল্যাণার্থে জন্মগ্রহণ করেছেন, সকলেই একবাক্যে বলে গিয়েছেন যে দুঃখ-কষ্টাদির হাত থেকে

রেহহি পেতে ও প্রকৃত আনন্দ বা জীবন, যশ, বৃদ্ধি পেতে হলে একমাত্র উপায় হচ্ছে—ইষ্টের আদিষ্ট পথে ঠিক ঠিক মত চলে, তাঁতে অটুট ভক্তি অর্জ্জন করা। আমাদের দয়াল ঠাকুরও সেই একই নির্দ্দেশ দিতেছেন। তিনি আমাদিগকে যে কতকগুলি নিয়ম পালন ও অন্তর অভ্যাসের ক্রিয়া করতে দিয়েছেন ওগুলিরও ঐ একই উদ্দেশ্য। এখন তাঁর আদেশ মত চলাটা ও করাটা হলো আমাদের হাতে। ঠিক ঠিক মত চলতে ও করতে পারলেই হয়। হতাশ হবার কিছু নেই, লেগে থাকতে থাকতে হবেই। ''হর্ঝো লাগি রহো ভাই, তেরা বনৎ বনৎ বন্ যায়।'' পথের সন্ধান তো পাওয়া গিয়েছে, এখন লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা আমাদিগকেই করতে হবে, তাঁরই কৃপার উপর নির্ভর করে।

''রা''

গান

(১)

জীবে শান্তি দিতে, পাপী উদ্ধারিতে,
নরদেহে তুমি, এসেছ ধরায়।
করজোড়ে আমি, ওগো রাধাস্বামী,
কোটি কোটি বার, প্রণমি তোমায়।।

(২)

কত যে কেঁদেছি, ডেকেছি তোমায়,
দয়া করে দেখা, দেও দয়াময়।
গুরুরূপে তুমি, হয়েছ উদয়,
গাহে বিশ্ববাসী আজ ''গুরুজীর জয়''।।

(৩)

দেখিয়া তোমাকে, ওগো প্রেমময়,
পাপ-তাপ রাশি, হলো সব ক্ষয়।
পরশে তোমার, নাচিছে হৃদয়,
শরণ লইনু আমি, ঐ রাঙ্গা পায়।।

(৪)

দেখো, দেখো দয়াল, এ দীন দাসেরে,
আর যেন যেতে, না হয় জঠরে।
(সদা) থাকি তব সনে, তব গুণগানে,
আনন্দে বিভোর হয়ে, ওগো প্রেমময়।।
